রক্ষীবাহিনীর অজানা অধ্যায়

কর্নেল সরোয়ার হোসেন মোল্লা (অব.)

রক্ষীবাহিনীর অজানা অধ্যায়

রক্ষীবাহিনীর অজানা অধ্যায়

কর্নেল সরোয়ার হোসেন মোল্লা (অব.)

অন্বেষা প্রকাশন

রক্ষীবাহিনীর অজানা অধ্যায়

কর্নেল সরোয়ার হোসেন মোল্লা (অব.)

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০১৪

অন্বেষা ৪১৩

প্রকাশক
মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন
অন্বেষা প্রকাশন
৯ বাংলাবাজার ঢাকা
ফোন : ৭১২৪৯৮৫, ০১৯১১৩৯৪৯১৭

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

অক্ষর বিন্যাস
মোঃ নাছির উদ্দিন

মুদ্রণ
পাণিনি প্রিন্টার্স
কলুটোলা, ঢাকা

যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশক
মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইট, নিউইয়র্ক

যুক্তরাজ্য পরিবেশক
সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিক লেন, লন্ডন

অনলাইন পরিবেশক
www.rokomari.com

মূল্য : ১৩৫.০০ টাকা মাত্র

Rokhhibahinir Ojana Odhae
by Kornel Sarowar Hossain Mullah (Ret.)
First Published February Book Fair 2014
Mohammed Shahadat Hossain
Annesha Prokashon, 9 Banglabazar, Dhaka.

www.ap-bd.com
e-mail : annesha_prokashon@yahoo.com

Price : Tk. 135.00 only US $05.00
ISBN : 978 984 7116 97 6 Code : 413

উৎসর্গ

মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশ নেভাল কমান্ডোর দুজন সদস্য মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান, গ্রাম বদরপাশা, ইউনিয়ন বদরপাশা, উপজেলা রাজৈর, জেলা মাদারীপুর। খবিরউজ্জামান (কবির), পিতা আবদুল জব্বার মৃধা, মাতা সুফিয়া খাতুন, গ্রাম বাহাদুরপুর, উপজেলা পাংশা, জেলা রাজবাড়ী।

চট্টগ্রাম পোর্ট অপারেশনের পর ভারতে যান। কিছুদিন পর তাঁরা আবার বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। আগমনের উদ্দেশ্য রাজৈরের টেকেরহাটে এবং শরীয়তপুরের আংগারিয়ায় দুটি অপারেশন করা। বাংলাদেশে এসে তাঁরা আমার পাইকপাড়ার দিঘুলিয়া গ্রামের আবদুল হালিম মুন্সির বাড়ির ক্যাম্পে যোগদান করেন। তাঁদের সঙ্গে দুটি লিমপেট মাইন ছিল, যা নৌযান ধ্বংসের কাজে ব্যবহার করা হয়। ১৮৭১-এর অক্টোবরের ১২ তারিখে টেকেরহাটের পাকিস্তানি সেনা বহনকারী দুটি লঞ্চে লিমপেট মাইন লাগানোর সময় শত্রুদের গুলিতে খবিরউজ্জামান (কবির) শহীদ হন। বাংলাদেশ সরকার পরবর্তী সময় শহীদ কবিরকে তাঁর সাহসিকতার জন্য বীরপ্রতীক উপাধিতে ভূষিত করে। দেশমাতৃকার মুক্তিসংগ্রামে এই মহান আত্মত্যাগের প্রতি আমার শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ এ বইটি আমি শহীদ কবির, বীরপ্রতীকের নামে উৎসর্গ করলাম।

ভূমিকা

'রক্ষীবাহিনীর অজানা অধ্যায়' লেখাটি ১০ পর্বে প্রকাশিত হয় 'বাংলাদেশ প্রতিদিন'-এ। লেখাটির পেছনে যাদের উদ্যোগ, সহযোগিতা, উপদেশ ও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে, তাদের সবাইকে আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি প্রথম আলোর সম্পাদক বন্ধুবর মতিউর রহমান, একই কাগজের সহযোগী সম্পাদক ও কবি সোহরাব হাসান এবং বাংলাদেশ প্রতিদিনের সম্পাদক স্নেহাস্পদ নঈম নিজামকে। তাদের প্রেরণা ও উৎসাহ না পেলে আমার পক্ষে হয়তো লেখাটি সম্ভব হতো না। এ ছাড়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ছোট ভাই আবদুর রহিমের প্রতি, যাকে জনাব সোহরাব হাসান পাঠিয়েছিলেন লেখার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করতে। লেখাটি বই আকারে প্রকাশের ব্যাপারে আমার তেমন আগ্রহ ছিল না। কারণ এটি কোনো বই হিসেবে আমি লিখিনি। রক্ষীবাহিনী সৃষ্টির পটভূমি, কার্যক্রম ও বিশেষভাবে ৭৫-এর ১৫ আগস্টে রক্ষীবাহিনীর ভূমিকা সম্পর্কে অনেকের যে ভুল বা অস্পষ্ট ধারণা ছিল, বাস্তবতার নিরিখে তার একটি সঠিক চিত্র দেশের মানুষের সামনে হাজির করার ঐতিহাসিক দায়বদ্ধতা থেকে উদ্যোগ গ্রহণ করি। বিষয়গুলো সংক্ষেপে উত্থাপন করার ইচ্ছা থাকায় বইটির কলেবর অনেক ছোট হয়, তাই এটি বই আকারে প্রকাশের ব্যাপারে দ্বিধান্বিত ছিলাম। তবুও স্নেহাস্পদ নঈম নিজামের বিশেষ আগ্রহে লেখাটি বই আকারে প্রকাশের এ প্রয়াস।

কর্নেল সরোয়ার হোসেন মোল্লা (অব.)

রক্ষীবাহিনীর অজানা অধ্যায়- ১

১৯৬৮ সাল। আমি তখন নাজিমুদ্দিন মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি (১৯৬৭-৬৮)। হঠাৎ একদিন শ্রদ্ধেয় রাজ্জাক ভাইয়ের সঙ্গে দেখা। রাজ্জাক ভাই মানে আওয়ামী লীগের প্রয়াত প্রেসিডিয়াম সদস্য আবদুর রাজ্জাক। তিনি বললেন, 'ঢাকায় এসে আমার সঙ্গে দেখা করবি, একটা জরুরি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব।' আমি ঢাকায় এসে তার সঙ্গে দেখা করি। তিনি আমাকে স্বাধীন বাংলা সংগ্রাম পরিষদ সম্পর্কে অবহিত করেন। আমাকে ওই সংগঠনের সদস্য হওয়ার জন্য বলেন। আমি জানতে চাইলাম এ সংগঠনের উদ্দেশ্য কি? তিনি বললেন, 'দেশকে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে মুক্ত করতে হলে আমাদের একটা সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি করতে হবে। এ সংগঠন দেশবাসীকে মুক্তির লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধ করবে।' এ উদ্দেশ্যে সদস্য সংগ্রহ করার কথাও বললেন তিনি। রাজ্জাক ভাই বললেন, কাজটি অনেক কঠিন। এই সংগঠনের সদস্যদের অনেক বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হবে। আমি নির্দ্বিধায় তার প্রস্তাবে রাজি হলাম এবং স্বাধীন বাংলা সংগ্রাম পরিষদের সদস্যপদ গ্রহণ করলাম। সদস্যপদ গ্রহণের নিয়মানুয়ায়ী রাজ্জাক ভাই আমার উমুবি এবং আমি তার নিমুবি। আমি যাদের রিক্রুট করব তারা আমার নিমুবি হবে এবং আমি হব তাদের উমুবি। এভাবেই স্বাধীন বাংলা সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে ধীরে ধীরে আমি জড়িয়ে পড়ি।

এ সংগঠনের বেশির ভাগ সদস্যই ছিল ছাত্র। আমাদের এই সংগঠনের প্রস্তুতি ছিল দীর্ঘ সময়ের জন্য। ১৯৭১ সালে মাত্র নয় মাসের মধ্যে দেশ মুক্ত হবে- তখন তা আমরা কল্পনাও করতে পারিনি। আমরা দীর্ঘ প্রস্তুতি নিয়ে এগুচ্ছিলাম। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পক্ষে সারা দেশের মানুষ যে গণরায় দেয়, তাতে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের পথ অনেকটা ত্বরান্বিত হয়। আমরা চিন্তাই করতে পারিনি এত তাড়াতাড়ি দেশ মুক্তির সংগ্রামে অবতীর্ণ হবে।

১৯৭০ সালের নির্বাচনের সময় আমি মাদারীপুরে অবস্থান করছিলাম। ওখানে সাংগঠনিক কাজের পাশাপাশি নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণায় অংশগ্রহণ করি। ফণিভূষণ মজুমদারসহ আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণায় রাজৈর, শিবচর, শরীয়তপুর প্রভৃতি এলাকায় যাই এবং জনসংযোগে অংশ নিই। তখন একই সঙ্গে দুটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এর একটি ছিল জাতীয় পরিষদ সদস্য বা এমএনএ অপরটি প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য বা এমপিএ নির্বাচন। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর টনক নড়ে। গণরায় উপেক্ষা করে তারা ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা শুরু করে। যার ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দানা বাঁধতে থাকে।

বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের বক্তৃতার শেষের দিকে বললেন– এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম। তখন আমাদের মনে কোনো সন্দেহ রইল না যে, সশস্ত্র সংগ্রাম অনিবার্য (সেদিন রেসকোর্স ময়দানে আমি উপস্থিত থেকে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনেছিলাম)। সেই অনুযায়ী আমি মাদারীপুরে চলে যাই এবং সেখানে ছাত্র-যুবক সবাইকে সংগঠিত করার কাজ শুরু করি।

যুদ্ধ চলাকালীন সময়

পাকিস্তানি কায়েমি স্বার্থবাদ বাঙালিদের ওপর শোষণ ও শাসন বজায় রাখতে ছিল বদ্ধপরিকর। তাই তারা জনগণের রায় উপেক্ষা করে মসনদ আঁকড়ে রাখতে দিগ্বিদিক হয়ে পড়েছিল। অবশেষে ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনারা অতর্কিতে এদেশের জনগণের ওপর হামলা চালায়। তখন আমি মাদারীপুরেই ছিলাম। রাতেই আমরা এই বর্বরোচিত হামলার খবর জানতে পারি। ২৫ মার্চের পর আমাদের কার্যক্রম আরও সুসংগঠিত করার জন্য আমরা আগ্নেয়াস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ শুরু করি। যার যা কিছু ছিল সিভিল গান বা রাইফেল, তা সংগ্রহ করে প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা চলে।

এ সময় খবর পেলাম ফরিদপুরে অস্ত্র কিনতে পাওয়া যায়। খবর পেয়ে প্রথমে ট্রেজারি থেকে টাকা উঠানোর কথা চিন্তা করলাম। পরে ভাবলাম আগে গিয়ে দেখি কি ধরনের অস্ত্র পাওয়া যায়, কি পরিমাণ টাকা লাগে। তারপর একজন এসে টাকা নিয়ে যাব। আমি আর ফণিভূষণ মজুমদার অস্ত্রের সন্ধানে ফরিদপুরের উদ্দেশে রওনা হলাম। ওখানে দেখা হলো বরিশালের আবদুর রব সেরনিয়াবাত ও ইউসুফ হুমায়ূনের সঙ্গে। ইউসুফ

হুমায়ূন বর্তমানে আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য। ফরিদপুরের ওবায়েদ ভাইয়ের সঙ্গে কথাবার্তা হলো। তিনি বললেন, 'এখানে কোনো অস্ত্রপাতি নেই। শুনেছি কুষ্টিয়ার ওদিকে নাকি পাওয়া যায়।' ফণিভূষণ মজুমদার, আবদুর রব সেরনিয়াবাত, ইউসুফ হুমায়ূনসহ আমরা বেশ কয়েকজন আবার ফরিদপুর থেকে চুয়াডাঙ্গায় গেলাম অস্ত্রের খোঁজে। ওখানে গিয়েও অস্ত্রের সন্ধান পেলাম না।

চুয়াডাঙ্গায় গিয়ে দেখা হলো মেজর ওসমানের সঙ্গে। তিনি বিডিআরে কর্মরত ছিলেন। ফণিদাকে উদ্দেশ করে মেজর ওসমান বললেন, আপনারা নেতৃস্থানীয় লোক। আপনারা ভারতে যান, গিয়ে দেখেন আমাদের জন্য কি সাহায্য করতে পারেন। উত্তরে ফণিদা বললেন, আমরা মাদারীপুর থেকে এসেছি অন্য একটা কাজে। এখান থেকে ভারতে গেলে লোকজন আমাকে কি মনে করবে। তাদের এই অবস্থায় রেখে চলে যাওয়াটা উচিত হবে না। অনেকবার বলার পর একপর্যায়ে মেজর ওসমান রাগান্বিত হয়ে বললেন, আপনাকে যেতেই হবে। ফণিদা বললেন, আপনি কে? ভারতে যাওয়া কিংবা না যাওয়া আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আপনি কেন আমাকে পীড়াপীড়ি করছেন! আপনি কি জানেন, আমি ব্রিটিশ সরকারের রোষানলে পড়ে ২৬ বছর জেল খেটেছি? তবুও কোথাও পালিয়ে যাইনি। মেজর ওসমান গলা নিচু করে বললেন, আসলে আমি ওভাবে বলিনি। আমি বলতে চেয়েছি আপনাদের সমৃদ্ধ পলিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড রয়েছে। আপনারা শীর্ষস্থানীয় নেতা। ভারতে গিয়ে এদেশের জন্য যদি কোনো সাহায্য-সহযোগিতা করতে পারেন, সে অনুরোধই করছিলাম। ফণিদা তাতেও রাজি হচ্ছিলেন না। তারপর সেরনিয়াবাত বললেন, দাদা চলেন আমরা ভারতে গিয়ে দেখি কি করা যায়। আমিও বললাম, চলেন দাদা যাই।

এরই মধ্যে খবর পেলাম ফরিদপুরে আর্মি চলে এসেছে। ওদিকে যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকেও আর্মি মুভ করছে। এ মুহূর্তে আমাদের মাদারীপুরে ফিরে যাওয়া নিরাপদ নয়। শেষপর্যন্ত আমরা চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা থানা দিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে কলকাতায় গেলাম। ওখানে শ্রী নিকেতন হোটেলের মালিক কালুর (পুরো নাম মনে নেই) সঙ্গে দেখা হলো। ফণিদা এবং কালু দুজনেই স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সেই সূত্রে তাদের ঘনিষ্ঠতা। ফণিদা বললেন, 'কালু, এই ছেলেটা আমার এলাকার মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার। ওর থাকা-খাওয়ার সব ব্যবস্থা করে দিবি। সেই মোতাবেক আমি ওখানে থাকি। ওখানেই রাজ্জাক ভাই সংবাদ

দিলেন– ট্রেনিংয়ের বন্দোবস্ত হচ্ছে। ট্রেনিংয়ের জন্য প্রস্তুত হতেও বললেন তিনি। সে অনুযায়ী আমরা যারা ছাত্রনেতা ছিলাম তারা অন্যদের নিয়ে প্রস্তুতি শুরু করলাম। রাজনৈতিক নেতারাও যোগ দিলেন আমাদের সঙ্গে। আমাদের এলাকার আরও কয়েকজন যাদের ট্রেনিংয়ের জন্য বাছাই করা হয়েছে, তারা একত্রিত হলাম। এদের মধ্যে ছিলেন ফরিদপুরের শাহ মোহাম্মদ আবু জাফর। যাই হোক, প্রথম স্তরে সবাইকে তো আর ট্রেনিংয়ে নেওয়া সম্ভব ছিল না। তাই ওখান থেকে বাছাই করে পাঠানো হলো। এপ্রিল মাসের দিকে আমরা ভারতে বিএলএফ বা বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্সেসের সদস্য হিসেবে প্রশিক্ষণ নিই। বিএলএফ পরবর্তীতে মুজিব বাহিনী নামে পরিচিতি লাভ করে। ভারতে যারা প্রশিক্ষণের জন্য গিয়েছিল তাদের মধ্যে আমরাই ছিলাম প্রথম ব্যাচ।

প্রথমে কলকাতা থেকে আমরা আসাম মেইলে করে একটি ট্রানজিট ক্যাম্পে গেলাম। ট্রানজিট ক্যাম্প থেকে আমাদের একটি প্লেনে করে নিয়ে গেল সাহারানপুর। ওখান থেকে আর্মির ট্রাকে করে টান্ডুয়া নিয়ে গেল, যেখান পাহাড়ের ওপর ট্রেনিং ক্যাম্প ছিল। এর অবস্থান ছিল উত্তর প্রদেশে। ওখানে আমাদের ক্র্যাশ ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা হলো। প্রধানত আমাদের ফিজিক্যাল ফিটনেস বাড়ানো এবং বিভিন্ন প্রকার অস্ত্র চালনা প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। পাশাপাশি থিউরিও শেখানো হতো– কিভাবে বোমা বানাতে হয়, কী কী উপাদান দরকার ইত্যাদি। আমরা তা খাতায় নোট করে নিতাম। কারণ আমাদের তো ধারণা ছিল না যে কবে যুদ্ধ শেষ হবে। হয়তো বছরের পর বছর যুদ্ধ চলতে থাকবে।

ট্রেনিংয়ে এই ক্র্যাশ প্রোগ্রামটা খুবই ডিফিক্যাল্ট ছিল। বিশেষ করে আমাদের জন্য। প্রশিক্ষণের একপর্যায়ে দেখা গেল আমাদের মধ্যে অনেকের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে। ফলে ট্রেনিং কমান্ডার আমাদের জন্য স্পেশাল ভিটামিন সাপ্লিমেন্ট দিতেন। যতদূর মনে পড়ে, ওখানে ৬ থেকে ৮ সপ্তাহের মতো ট্রেনিং দেওয়া হয়। এর পর আমাদের আবার কলকাতায় নিয়ে আসা হলো। জুন মাসের দিকে আমরা বাংলাদেশে প্রবেশ করি, সংখ্যায় ছিলাম ৮০ জন। ৮০ জনের মধ্যে কেউ কেউ ফদিপুরের, মাদারীপুর বা বরিশালের। তারা যার যার এলাকায় চলে গেলেন। আমি আমার এলাকা মাদারীপুরে ফিরে এলাম। শাহ মোহাম্মদ আবু জাফর ফরিদপুরে রয়ে গেলেন।

আমার সঙ্গে অন্যান্য থানার যারা ছিল তাদের দায়িত্ব দিয়ে স্ব স্ব থানায় পাঠানো হলো। এলাকায় গিয়ে প্রথমে ট্রেনিং ক্যাম্প স্থাপন করে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করি। আমি এলাকায় পৌছানোর আগেই মুক্তিবাহিনীর একটি গ্রুপ আমাদের এলাকায় অবস্থান করছিল। যদিও আমি মুজিব বাহিনীর দায়িত্বে ছিলাম, তারা আমাকে পেয়ে বেশ আনন্দিত হলো এবং স্বেচ্ছায় আমার সঙ্গে যোগদান করল। আমাদের ওখানে দুই নম্বর সেক্টর থেকে এমনকি আট ও নয় নম্বর সেক্টর থেকেও মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা আসতে শুরু করল। ছোট গ্রুপে বিভক্ত হয়ে গ্রুপ কমান্ডার হিসেবে এদের অনেকেই আমার সঙ্গে যোগদান করে। যদিও আমি ছিলাম মুজিব বাহিনীর তার পরও আমি সিনিয়র ও সবার কাছে মোটামুটি পরিচিত এবং গ্রহণযোগ্য হওয়ার কারণে আমার সঙ্গে কাজ করতে তাদের কোনোরকম অসুবিধা ছিল না।

মুজিব বাহিনীর সদস্যরা সংখ্যায় খুব বেশি ছিল না। আমাদের প্রধান কাজ ছিল লিডারশিপ দেওয়া, গাইড করা, মানুষকে বোঝানো, মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে জনমত গড়ে তোলা। আমি আগেই বলেছি, যুদ্ধের স্থায়িত্ব আমাদের সবার অজানা। দীর্ঘস্থায়ী একটা যুদ্ধকে এগিয়ে নেওয়া জনগণের সমর্থন ছাড়া কেবল কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধার পক্ষে সম্ভব নয়। জনসমর্থন নিশ্চিত করার পলিটিক্যাল কর্মকাণ্ডই ছিল আমাদের প্রধান কাজ। তবে শুধু পলিটিক্স দিয়ে তো আর মানুষ ধরে রাখা যায় না, যদি না তাদের শেল্টার দিতে পারি। এ কারণে তখন আমাদের কিছু কিছু অ্যাকশনে যেতে হয়েছে। যেমন থানায় অ্যাটাক করা, রাস্তায় অ্যাম্বুশ করা ইত্যাদি।

১৯৭১ সালে মুক্তিযোদ্ধাদের অনেকগুলো বাহিনী গঠিত হয়েছিল। এর মধ্যে শুধু মুজিব বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর কার্যক্রম ছিল সারা দেশে বিস্তৃত। অন্যান্য বাহিনী ছিল এলাকাভিত্তিক। মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে মুজিব বাহিনীর কিছু তফাৎ ছিল। মুক্তিবাহিনী প্রথমে একটি কনভেনশনাল ফোর্স হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। যার সব সেক্টর কমান্ডার ছিলেন আর্মি পারসন। জেনারেল ওসমানী ছিলেন কমান্ডার ইন চিফ। ওভার অল সুপারভিশনে ছিলেন তাজউদ্দিন আহমদ।

আর প্রাথমিক পর্যায়ে মুজিব বাহিনী বা বিএলএফ ছিল একটি রাজনৈতিক ফোর্স এবং দেশের মানুষকে রাজনৈতিকভাবে মোটিভেশনের জন্য গঠিত। অনেক সময় দেখা যায় কোনো দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে ক্ষমতা চলে যায় প্রতিবিপ্লবীদের হাতে। ফলে দেশের অভ্যন্তরে শুরু হয় অরাজকতা। পলিটিক্সের পাশাপাশি সশস্ত্র সংগ্রামে যুক্ত না থাকলে

লিডারশিপটা তখন হাতে থাকে না। বিএলএফ বা মুজিব বাহিনী সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল একটি দীর্ঘস্থায়ী মুক্তি সংগ্রামের জন্য দেশের সাধারণ মানুষকে মনস্তাত্ত্বিকভাবে প্রস্তুতি গ্রহণে সহযোগিতা করা। তাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে রাজনৈতিকভাবে উদ্বুদ্ধ করা। পরস্পরের মধ্যে সমন্বয় সাধনও ছিল মুজিব বাহিনীর অন্যতম উদ্দেশ্য। গেরিলা আক্রমণের মাধ্যমে শত্রুকে পর্যুদস্ত করা এবং জনগণকে সম্পৃক্ত করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের দেশীয় দোসরদের গণবিচ্ছিন্ন করাও ছিল আমাদের লক্ষ্য। মুক্তি সংগ্রামের ফসল যেন কোনো প্রতিবিপ্লবীদের হাতে না যায়, তার জন্য সশস্ত্রভাবে প্রস্তুত থাকাও ছিল মুজিব বাহিনীর প্রধান কাজ। সহজ ভাষায় বলা যায়, যুদ্ধের পরে দেশে যেন একটি গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় সেই দিকটিও নিশ্চিত করা।

মুজিব বাহিনীর সৃষ্টি নিয়ে প্রথমে বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে কিছুটা ভুল বোঝাবুঝি ছিল। পরবর্তীতে এ বাহিনী সৃষ্টির বাস্তব প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে বাংলাদেশ সরকার অনুমোদন প্রদান করে। মুজিব বাহিনীর প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ ভারত সরকারের পক্ষ থেকে করা হয়। ভারত সরকারের প্রধানমন্ত্রীর কেবিনেট সেক্রেটারি এসব কাজ তদারক করতেন।

মুজিব বাহিনীই হোক আর মুক্তিবাহিনীই হোক সবারই লক্ষ্য ছিল একটা। কিন্তু তারপরও অনেক জায়গায় এদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে। সীমান্ত দিয়ে প্রবেশের সময় আর্মিদের হাতে অনেক দুর্ঘটনাও ঘটেছে।

বিএলএফ বা মুজিব বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন শেখ ফজলুল হক মণি, সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক এবং তোফায়েল আহমেদ। মুজিব বাহিনীকে চারটি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়। সেক্টর-একের দায়িত্বে ছিলেন মণি ভাই। সেক্টর-দুইয়ের দায়িত্বে ছিলেন সিরাজুল আলম খান। সেক্টর-তিনের দায়িত্বে আবদুর রাজ্জাক। সেক্টর-চারের দায়িত্বে তোফায়েল আহমেদ। আমি সেক্টর-চারে তোফায়েল আহমেদের নেতৃত্বে যুদ্ধ পরিচালনা করি। আমাকে মুজিব বাহিনীর বৃহত্তর মাদারীপুর জেলার (বর্তমানে মাদারীপুর-শরীয়তপুর) দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। যুদ্ধ চলাকালীন আমি বিভিন্ন বিষয়ে মুজিবনগর সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতাম। বিশেষভাবে তোফায়েল ভাইয়ের সঙ্গে। যুদ্ধের এক পর্যায়ে লক্ষ্য করলাম, মুজিব বাহিনী এবং মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে অনেক জায়গায় অনেক ব্যাপারে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হচ্ছে। কারণ মাদারীপুরের অবস্থান এরকমই যে, সেখানে দুই নম্বর, সাত নম্বর, আট নম্বর এবং নয় নম্বর সেক্টর থেকে মুক্তিবাহিনীরা

আসত। প্রত্যেক সেক্টর কমান্ডার তাদের প্রেরিত মুক্তিযোদ্ধাদের স্ব স্ব রাজনৈতিক মতাদর্শের ওপর ভিত্তি করে বিবৃতি দিতেন। তাতে বিশেষ করে সেক্টর কমান্ডারদের প্রতি আনুগত্যের বিষয়টি প্রাধান্য পেত। তারা স্থানীয় কমান্ডারদের কমান্ড মানত না। যার ফলে মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের মধ্যে সন্দেহ, অবিশ্বাস ও সাংঘর্ষিক অবস্থার সৃষ্টি হয়। আগেই বলেছি, যেহেতু আমি মাদারীপুর কলেজে লেখাপড়া করেছি, ওখানে ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। সে কারণে সব এলাকার ছেলেদের সঙ্গে আমার আগে থেকেই পরিচয় এবং সদ্ভাব ছিল। এ জন্য ব্যক্তিগতভাবে আমার কোনো অসুবিধা হয়নি। আমি মোটামুটিভাবে সবাইকে নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করেছি। মুক্তিবাহিনী ও মুজিব বাহিনীর বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে মাঝেমধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিত। আমি ব্যক্তিগতভাবে মাদারীপুরের সব থানায় গিয়েছি এবং চেষ্টা করেছি সর্বপ্রকার দ্বন্দ্ব মিটিয়ে সবাইকে নিয়ে মিলেমিশে কাজ করার জন্য। আমার মূল কাজই ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে একটা সমন্বয় সৃষ্টি করা। তার পরও একপর্যায়ে আমি বুঝতে পারলাম যদি আমরা সমন্বয়হীনভাবে কাজ করি এবং মুক্তিযোদ্ধারা ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপের হয়ে কাজ করে তাহলে আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের পথটি অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। কারণ আমি দেখেছি বিভিন্ন কমান্ডাররা বিভিন্ন জায়গায় Independent war Lord হিসেবে কাজ করতে শুরু করে। মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে সংঘাত তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। এর ফলে আমরা আমাদের অনেক বন্ধুকেও হারিয়েছি। পরিস্থিতি ক্রমান্বয়ে এমন আকার ধারণ করে যে, দেখা গেল একটি থানায় চার-পাঁচজনকে থানা কমান্ডার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। কারণ হিসেবে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, একেক সেক্টর থেকে একেকজনকে বিভিন্ন থানায় পাঠানো হয় এবং তিনি এসে নিজেকে থানা কমান্ডার হিসেবে দাবি করেন। যার ফলে বিভিন্ন কমান্ডারের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি হতে থাকে এবং সংঘর্ষ দিনের পর দিন বাড়তেই থাকে। যোদ্ধারা ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়ে। মুক্তিযোদ্ধাদের ছোট গ্রুপের ওপর বড় গ্রুপ হামলা চালিয়ে তাদের অস্ত্রশস্ত্র লুট করত। মুক্তিযোদ্ধারা যে একই ইউনিট, একটি লক্ষ্যকে সামনে রেখে যুদ্ধে নেমেছে, সেটি আস্তে আস্তে ব্রেক করে ব্যক্তির প্রাধান্যটাই সামনে চলে আসতে থাকে।

রক্ষীবাহিনীর অজানা অধ্যায়- ২

মুক্তিবাহিনীর সমন্বয়হীনতা এবং পারস্পরিক দ্বন্দ্বে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি বেড়ে যায়। তাদের আচার-আচরণে স্থানীয় জনগণ মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পর্কে বিরূপ ধারণা পোষণ করতে শুরু করে। আমি বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে পাঁচ পৃষ্ঠার একটি দীর্ঘ চিঠি লিখি তোফায়েল ভাইকে। এই চিঠিতে আমি বিভিন্ন স্থানের বাস্তব চিত্রের বর্ণনা দিয়ে অনুরোধ করি, যদি বিষয়টি কেন্দ্রীয়ভাবে সমন্বয় করা না হয়, তাহলে এক সময় তা ভয়াবহ রূপ নিতে পারে। পাকিস্তানি সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত না হয়ে তখন তারা নিজেরা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে একে অপরের সংহারে মেতে উঠবে। তাই আমি তোফায়েল ভাইকে বিশেষভাবে অনুরোধ করি যেন আমার চিঠির বিষয়বস্তু সরকারি পর্যায়ে জানানো হয়। সমন্বয় সৃষ্টির জন্য অতি সত্বর যদি ব্যবস্থা না নেওয়া হয় তাহলে একটা দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধকে Sustain করা আমাদের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। ব্যক্তিগতভাবে ভারতের সেনাবাহিনী বাংলাদেশের ভেতরে আসুক এবং আমাদের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করুক এটা আমি কোনো দিনই চাইনি। কারণ তাতে আমরা যারা মুক্তিযোদ্ধা, তাদের অবদান অনেকাংশে ম্লান হয়ে যাবে। অন্যের দেওয়া একটা স্বাধীনতা আমাদের কাছে আসবে। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন গ্রুপের সাংঘর্ষিক অবস্থা, ব্যক্তিগত স্বার্থে আধিপত্য বিস্তারের প্রবণতা দিনের পর দিন এমন এক অসহনীয় অবস্থার দিকে ধাবিত হচ্ছিল যে, যুদ্ধের পরিণাম নিয়ে শঙ্কা সৃষ্টি করছিল। এক পর্যায়ে মনে হয়েছে যদি ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশের ভেতরে মার্চ না করত এবং নয় মাসে দেশ স্বাধীন না হতো তাহলে এ দেশের মানুষের দুর্ভোগের কাহিনী আরও দীর্ঘায়িত ও মর্মান্তিক হতো। যুদ্ধের একপর্যায়ে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসের দিকে আমার শরীর ভীষণ খারাপ হয়ে যায়। কুরিয়ারের মাধ্যমে এ কথা জানতে পেরে শ্রদ্ধেয় ফণীভূষণ মজুমদার আমাকে একটি চিঠি লেখেন এবং কলকাতায় গিয়ে চিকিৎসা করার কথা বলেন। আমি যেতে পারিনি। কারণ

আমার ভয় ছিল, ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও চেষ্টার মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে সহযোগিতা ও সহমর্মিতার পরিবেশ বজায় রাখার যে প্রচেষ্টা আমি অব্যাহত রেখেছি, আমার অবর্তমানে তা ভেঙে তছনছ হয়ে যেতে পারে।

উল্লেখ্য, আমরা ভারতে প্রশিক্ষণ নিতে যাওয়ার পরপরই মাদারীপুরে পাকিস্তানি আর্মি আস্তানা গাড়ে। তারিখটি আমার সঠিক মনে নেই, হয়তো ১৭-১৮ এপ্রিল হতে পারে। এরপরে আমরা প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশে ফিরে এসে অন্য যোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দিলাম। মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যাও দিন দিন বাড়তে লাগল। একের পর এক গেরিলা হামলায় পাকসেনারাও দিশেহারা। ৯ ডিসেম্বর মাদারীপুর আমাদের দখলে আসে। ওই দিন রাতে পাকিস্তানি সেনারা মাদারীপুর ছেড়ে চলে যায়।

যুদ্ধ-পরবর্তী সময়

দেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার পর যারা '৭০-এর নির্বাচনে জাতীয় পরিষদ সদস্য (এমএনএ) এবং প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য (এমপিএ) হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন, তারা দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়নে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন পরিষদের সদস্য হন। তাদের বলা হতো এমসিএ।

দেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার পরে ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে রাজ্জাক ভাই আমাকে চিকিৎসার জন্য পিজি হাসপাতালে নিয়ে যান এবং জাতীয় অধ্যাপক নুরুল ইসলামের অধীনে ভর্তির ব্যবস্থা করেন। হাসপাতালে থাকা অবস্থায় রাজ্জাক ভাই একদিন আমাকে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করানোর জন্য নিয়ে যান। বঙ্গবন্ধু আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করেন, 'তুই এমন কি করেছিস? সবাই তোর এতো প্রশংসা করে।' বুঝতে পারলাম, মণি ভাই, সিরাজ ভাই, রাজ্জাক ভাই, তোফায়েল ভাই আমার সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুকে অনেক ভালো কথা বলেছেন। কথাবার্তার এক পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুই কী চাস?' উত্তরে আমি বললাম, বঙ্গবন্ধু, দেশের স্বাধীনতা পেয়েছি, আপনাকেও পেয়েছি, এখন চাওয়ার আর কিছুই নাই।

বঙ্গবন্ধু তারপরও বারবার জিজ্ঞাসা করছিলেন, 'বল কী চাস?' তারপর এক সময় বললাম, বঙ্গবন্ধু, ছোটবেলা থেকে আমার ব্যারিস্টারি পড়ার ইচ্ছা। যদি সম্ভব হয়...। বঙ্গবন্ধু তার সচিব রফিকুল্লাহ চৌধুরীকে ডেকে বললেন, সরোয়ার ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য লন্ডনে যাবে। কিভাবে এটা হতে পারে, সে ব্যাপারে তার পরামর্শ চাইলেন। রফিকুল্লাহ চৌধুরী সাহেব বঙ্গবন্ধুকে বললেন, অতি সহজ ব্যাপার। সরোয়ারের জন্য একটা পারসোনাল পোস্ট তৈরি করা হবে আমাদের লন্ডন মিশনে। সরোয়ার ওই

পোস্টে চাকরি করবে এবং পড়াশোনা চালিয়ে যাবে। ব্যারিস্টারি পড়া শেষ হলে বাংলাদেশে চলে আসবে এবং ওই পোস্টটাও আপনা-আপনি বিলুপ্ত হবে। বঙ্গবন্ধু তখন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ সাহেবের সঙ্গে আলাপ করলেন এবং বললেন একটা পদ সৃষ্টি করার জন্য।

অতঃপর ৩০ জানুয়ারি পল্টন ময়দানে বঙ্গবন্ধুর কাছে অস্ত্র সমর্পণ করার জন্য আমরা ৮-১০টি লঞ্চযোগে মাদারীপুর থেকে ঢাকায় আসি। সদরঘাটে আমাদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য সিরাজ ভাই, রাজ্জাক ভাই, তোফায়েল ভাই উপস্থিত ছিলেন। তোফায়েল ভাই প্রথমে আমাকে বলেন, আমরা তোমার জন্য একটি নতুন দায়িত্বের কথা চিন্তা করেছি। মণি ভাই তোমাকে জানাবে। এরপর সিরাজ ভাই, রাজ্জাক ভাইও আমাকে একই কথা বললেন। ব্যাপারটি আমার কাছে রহস্যজনক মনে হলেও কাউকে জিজ্ঞেস করতে পারিনি। অস্ত্র সমর্পণের পরের দিন সিরাজ ভাই, রাজ্জাক ভাই, তোফায়েল ভাই আমাকে নিয়ে মণি ভাইয়ের বাসায় যান। মণি ভাইকে সঙ্গে করে আমরা বঙ্গবন্ধুর অফিসে যাই। সেখানে গিয়ে বন্ধুবর আনোয়ারুল আলমের (শহীদ) সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তিনি ছাত্রজীবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের জেনারেল সেক্রেটারি (জিএস) ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় টাঙ্গাইলে কাদের বাহিনীর পলিটিক্যাল কার্যক্রমের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

রক্ষীবাহিনী গঠন

বঙ্গবন্ধু আমাকে দেখে বললেন, তোকে যে কথা দিয়েছিলাম, তা রাখতে আমার কোনো আপত্তি নেই। তারচেয়েও আরেকটি বড় দায়িত্বপূর্ণ কাজের জন্য তোকে স্থির করা হয়েছে। আমি মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে একটি নতুন ফোর্স গঠন করতে চাই। কমান্ডার যাকে বানাবো সে ইতোমধ্যে নির্ধারিত হয়ে আছে। আমি দু'জন ডেপুটি কমান্ডার চেয়েছিলাম। মণি, সিরাজ, রাজ্জাক, তোফায়েল সবাই মিলে তোকে এবং শহীদকে সিলেক্ট করেছে। পরে অবশ্য আরও কয়েকজনকে ডেপুটি পরিচালক হিসেবে রক্ষীবাহিনীতে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। যা হোক, আমি বললাম, বঙ্গবন্ধু আমরা স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছি গেরিলা হিসেবে। কনভেনশনাল ফোর্স তৈরির কোনো অভিজ্ঞতা আমাদের নেই। কাজেই এই গুরুদায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা আমাদের পক্ষে কতটা সম্ভব হবে জানি না। তিনি বললেন, এটা কোনো সমস্যা হবে না। আমি বিদেশ থেকে তোমাদের উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা করব। তবুও এই প্রস্তাবটিতে আমাদের দুজনের কেউই স্বস্তিবোধ করছিলাম না। যুদ্ধ শেষে সরকারি চাকরিতে যোগদান করব এমনটা কখনো

ভাবিনি। শেষপর্যন্ত সেটাই হলো। প্রশ্ন জাগতে পারে, আমার মতো আরও কত কমান্ডার থাকতে বঙ্গবন্ধু কেন আমাকে সিলেক্ট করলেন। আসলে মুক্তিযুদ্ধের সময় নেতৃস্থানীয়রা বাংলাদেশের কোথায় কি হচ্ছে, কে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করছে কিংবা কে করছে না ইত্যাদি সব খবর রাখতেন। তোফায়েল ভাইয়ের সঙ্গে তো আমার প্রতিনিয়ত যোগাযোগ ছিলই। মাঝে মাঝে রাজ্জাক ভাইকেও চিঠি লিখতাম। তোফায়েল ভাইকে প্রায়ই চিঠির মাধ্যমে বিদ্যমান পরিস্থিতির কথা জানাতাম। কি করা উচিত বা উচিত নয়, এসব বিষয়েও পরামর্শ করতাম। কোথাও সমন্বয়হীনতা দেখা দিলে সমন্বয় করার চেষ্টা করতাম। তারা আমার কর্মকাণ্ডে খুশি ছিলেন। পরে শুনেছি তোফায়েল ভাই নাকি আমার লেখা চিঠিগুলো সংরক্ষণ করতেন। কেন্দ্রীয় নেতারা এক জায়গায় হলে এসব বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা হতো। বঙ্গবন্ধু যখন বললেন, আমি একটি বাহিনী গঠন করতে চাই। পরিচালক ঠিক করা আছে। আমাকে দুজন উপ-পরিচালক দাও। তখন রাজ্জাক ভাই, মণি ভাই, সিরাজ ভাই, তোফায়েল ভাই নিজেরা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আমাকে ও আনোয়ারুল আলমকে (শহীদ) সিলেক্ট করেন।

নির্ধারিত হলো ব্রিগেডিয়ার এএনএম নুরুজ্জামান এই বাহিনীর পরিচালক হবেন। আমি ও শহীদ উপ-পরিচালক। দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে আমরা পিলখানায় জড়ো হলাম। তাদের সংখ্যা আনুমানিক তিন হাজার। পরবর্তীতে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল প্রাক্তন ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের (ইপিআর) সদস্য এবং মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে একটি নতুন বাহিনী গঠন করা হবে। যার নাম হবে ন্যাশনাল মিলিশিয়া এবং সদর দফতর হবে পিলখানা। এ বাহিনী প্যারা-মিলিটারি হিসেবে কাজ করবে। অল্প কিছুদিনের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়, প্রাক্তন ইপিআর সদস্য এবং মুক্তিযোদ্ধাদের মন-মানসিকতার মধ্যে রয়েছে বিরাট তফাৎ। চিন্তা-চেতনার দিক দিয়ে দুই ভিন্ন মেরুতে তাদের অবস্থান। ইতিমধ্যে একটি দুর্ঘটনা ঘটে। ব্রিগেডিয়ার নুরুজ্জামান এবং আনোয়ারুল আলম (শহীদ) ইপিআর সৈনিকদের হাতে আহত হন। এর ফলে প্রাক্তন ইপিআর এবং মুক্তিযোদ্ধা সৈন্যদের মধ্যে প্রচণ্ড গোলাগুলি বিনিময় হয়। এ ঘটনায় বঙ্গবন্ধু নিজেই চলে আসেন পিলখানায়। আমাকে জিজ্ঞেস করা হলে আমি বঙ্গবন্ধুকে ঘটনার বিবরণ দেই এবং বলি, দুই বিপরীত মন-মানসিকতাসম্পন্ন প্রাক্তন ইপিআর সদস্য এবং মুক্তিযোদ্ধাদের একসঙ্গে কাজ করা খুবই কঠিন। এরপর বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে প্রাক্তন ইপিআর সৈনিকদের আলাদা করে দেওয়া হয়। সিদ্ধান্ত হয়, মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে যে নতুন বাহিনী গঠন করা হবে তার নাম হবে ন্যাশনাল সিকিউরিটি ফোর্সেস।

সংক্ষেপে এনএসএফ। এনএসএফ শব্দটি আমার এবং শহীদের কাছে গ্রহণেযোগ্য ছিল না। ফলে আমরা এনএসএফের বাংলা জাতীয় রক্ষীবাহিনী নামকরণের পরামর্শ দেই। এভাবেই জাতীয় রক্ষীবাহিনী নামটির সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে রক্ষীবাহিনী অ্যাক্ট এবং অন্যান্য আইন-কানুন নির্ধারণ করা হয়।

১৯৭২ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি জাতীয় রক্ষীবাহিনী গঠিত হয়। অনেকের ধারণা মুজিব বাহিনীর সদস্যদের নিয়ে রক্ষীবাহিনী গঠিত হয়েছিল। আসলে তা নয়। এখানে মুজিব বাহিনী, মুক্তিবাহিনী, কাদের বাহিনীর সদস্য ছিল। এর বাইরেও অনেক মুক্তিযোদ্ধাকে রক্ষীবাহিনীতে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল।

রক্ষীবাহিনীর কাপড়-চোপড়, গোলাবারুদ, বুট ইত্যাদি ভারত থেকে আসত। সাভারে প্রশিক্ষণের জন্য ভারত থেকে প্রশিক্ষক আনা হয়েছিল। রক্ষীবাহিনীর অফিসারদের বেসিক ট্রেনিং ভারতে দেওয়া হতো এবং তাদের স্পেশালাইজড কোর্সও ভারতে করানো হতো। ভারতীয় সেনাবাহিনীর জলপাই রঙের কাপড় দিয়ে রক্ষীবাহিনীর পোশাক তৈরি হতো। এ কারণে রক্ষীবাহিনীকে ভারতের চর হিসেবে নিন্দুকেরা অপবাদ দিতো। সত্যিকার অর্থে ওই অপবাদের কোনো সত্যতা ছিল না। আসলে সে সময়ে রক্ষীবাহিনীর মতো একটি ফোর্সকে সংগঠিত করার মতো আর্থিক সঙ্গতি বাংলাদেশ সরকারের ছিল না। দ্বিতীয়ত, এই বাহিনী তৈরির পেছনে আসল যে উদ্দেশ্য কাজ করেছে, তাহলো সদ্যস্বাধীন দেশের সেনাবাহিনীর পরিসর এবং সংখ্যা বাড়ানো হলে– এ বিষয়টি ভারত সরকার হয়তো ভালো দৃষ্টিতে দেখবে না। সুতরাং ভারতের সাহায্য এবং সহযোগিতায় একটি প্যারা মিলিটারি ফোর্স দাঁড় করানো হলে, ভারত হয়তো মনে করবে এই ফোর্স তাদের অনুগত থাকবে। এ কারণে ভারত সরকার বিনাদ্বিধায় সব ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করবে। যদিও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা রক্ষীবাহিনীকে সব সময় ভারত-ঘেঁষা ফোর্স বলে আখ্যায়িত করতেন। কিন্তু এ ব্যাপারে বঙ্গবন্ধুর ভিশন ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলতেন, আমার ছেলেরা কোনোদিনও দেশের সঙ্গে বেইমানি. করবে না। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ ছিল সম্পূর্ণ পরিষ্কার। তিনি বলতেন, রক্ষীবাহিনীকে সেনাবাহিনীর মতো প্রশিক্ষণ দিতে হবে। যাতে করে প্রয়োজনে রক্ষীবাহিনী সেনাবাহিনীর পাশে দাঁড়াতে পারে। রক্ষীবাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় ১২ হাজার। মোট ১৫টি ব্যাটালিয়ন ছিল। এর মধ্যে ১২টি রেগুলার ব্যাটালিয়ন এবং ৩টি ছিল রিক্রুট ব্যাটালিয়ন। রিক্রুট ব্যাটালিয়নের অবস্থান ছিল সাভার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। রক্ষীবাহিনীর প্রশিক্ষণ সম্পর্কে আমরা অত্যন্ত সজাগ ছিলাম। প্রশিক্ষণ এবং শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে কোনো ধরনের কম্প্রোমাইজ করা হতো না।

রক্ষীবাহিনীর অজানা অধ্যায়- ৩

রক্ষীবাহিনীর কঠোর মনোভাব এবং সুশৃঙ্খল দায়িত্ব পালনের বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গেলে সেই সময়কার (১৯৭২/৭৩) বিরাজমান আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির দিকে দৃষ্টি দেওয়া জরুরি। সে সময় সারা দেশে প্রায় ৭০টি থানা লুট হয়েছিল। মা-বোনেরা ইজ্জত সহকারে রাস্তায় চলাফেরা করতে পারতেন না। নিউমার্কেটে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের ধরে তাদের পেটে আলকাতরা মেখে দেওয়া হয়েছিল। মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় দিন কাটাত। বেআইনি অস্ত্র ছিল ঘরে ঘরে। সারা দেশে পুলিশ ফোর্স Effectively কাজ করতে পারছিল না। তাই প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পরে ব্যাটালিয়নকে যখন বাইরে পাঠানো হতো, তখন আমরা একটা কঠোর ব্রিফিংয়ের ব্যবস্থা করতাম। সেখানে স্পষ্ট ভাষায় বলা হতো, দায়িত্ব পালনে গাফিলতি হলে কঠিন পরিণতি ভোগ করতে হবে। কারও বাড়িতে আগুন দিলে কিংবা কোনো বৃদ্ধ বা মহিলার সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ করলে কঠোর শাস্তি পেতে হবে। কোনো সৈনিকের রাইফেল ছিনতাই হলে তার চাকরি চলে যাবে। রক্ষীবাহিনীর সদস্যদের ওপর কেউ গুলি করলে পাল্টা গুলি করার নির্দেশ ছিল। তবে বাড়াবাড়ির ক্ষেত্রে পরিষ্কার নির্দেশ ছিল 'Authority will not tolerate any kind of excess initiative unless it was found to have been done in good faith.' এখানে উল্লেখ্য যে, রক্ষীবাহিনীর সদস্যরা জেলা প্রশাসক বা মহকুমা প্রশাসকের নির্দেশ বা অনুমতি ছাড়া কোনো অপারেশনে যেত না। এসব ক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে পুলিশ কর্মকর্তা বা ম্যাজিস্ট্রেট থাকতেন।

আইনশৃঙ্খলার এই অরাজক পরিস্থিতিতে রক্ষীবাহিনীর দায়িত্ব পালনকালে যে দুয়েকটি দুর্ঘটনা ঘটেনি, এমন কথা বলা যাবে না। তবে বর্তমান সময়ে অনুরূপ বাহিনীর সদস্যদের হাতে এনকাউন্টারের নামে যতগুলো ঘটনা ঘটেছে তার তুলনায় রক্ষীবাহিনীর হাতে সংঘটিত দুর্ঘটনার সংখ্যা অতি নগণ্য। মতলববাজ রাজনীতিবিদ বা স্বার্থান্বেষী মহল থেকে রক্ষীবাহিনীর বিরুদ্ধে

অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। এমন অভিযোগও রয়েছে, রক্ষীবাহিনী নাকি হাজার হাজার বিপ্লবীকে হত্যা করেছে। এটি সম্পূর্ণভাবে একটি রাজনৈতিক প্রপাগান্ডা। এর সঙ্গে সত্যতার কোনো সম্পর্ক নেই। উল্লেখ্য, ১৯৭৫ সালে রক্ষীবাহিনী বিলুপ্তির পরে শুধু একজন অফিসারের বিরুদ্ধে একটি হত্যা মামলার অভিযোগ আনা হয়েছিল। তাও শেষপর্যন্ত আদালতে প্রমাণিত হয়নি। যদি স্বার্থান্বেষী মহলের অপবাদ বা রটনা সত্য হতো, তাহলে '৭৫-পরবর্তীকালে এই বাহিনীর সদস্যদের বিরুদ্ধে শত শত গুম ও হত্যা মামলা করা হতো। কিন্তু এমন কোনো ঘটনা কোথাও ঘটেনি।

রক্ষীবাহিনীর কোনো একটি ব্যাটালিয়ন বা কোনো একটি কোম্পানি কোথাও deployment করতে হলে আমরা বিভ্রান্তিজনক বা Deceptive পন্থা অবলম্বন করতাম। যেমন– বরিশালে একটি কোম্পানি পাঠাতে হলে আমরা ইচ্ছা করে একটি ব্যাটালিয়ন পাঠাতাম যেখানে ৩০-৩৫টি ট্রাক থাকত। এর উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ জনগণের মধ্যে একটা ইমপ্যাক্ট সৃষ্টি করা। একদিন বা দুদিন অবস্থানের পর একটি বা দুটি প্লাটুন রেখে সমস্ত ফোর্স ঢাকায় নিয়ে আসতাম। এ পদ্ধতি অবলম্বন না করলে রক্ষীবাহিনীর সীমিত ফোর্স দিয়ে সারা দেশে অপারেশন পরিচালনা করা সম্ভব হতো না। '৭৫-পরবর্তীকালে যখন রক্ষীবাহিনীকে সেনাবাহিনীর সঙ্গে একীভূত করা হলো এবং রাতারাতি সেনাবাহিনী ব্রিগেড কনসেপ্ট থেকে ডিভিশন কনসেপ্টে উন্নীত হলো, তখন বঙ্গবন্ধুর সেই ভবিষ্যদ্বাণীই সত্য প্রমাণিত হলো, 'প্রয়োজনে আমার ছেলেরা সেনাবাহিনীর পাশে দাঁড়াবে। আমার ছেলেরা কোনোদিন দেশের সঙ্গে বেইমানি করবে না।'

রক্ষীবাহিনী প্রশাসনিকভাবে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের অধীনে ছিল। প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের একজন যুগ্ম সচিব এর প্রশাসনিক কার্যক্রম দেখাশোনা করতেন। রক্ষীবাহিনীর দায়িত্বের মধ্যে প্রথমে ছিল সিভিল প্রশাসনের সাহায্যে কাজ করা। জরুরি অবস্থায় যে কাজের দায়িত্ব দেবে সরকার সে দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা এবং বিদেশী শত্রুর আক্রমণ মোকাবেলায় সেনাবাহিনীর অধীনে থেকে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য কাজ করা।

মিলিশিয়া ক্যাম্প স্থাপন

১৯৭২ সালে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিভিন্ন জেলায় মিলিশিয়া ক্যাম্প স্থাপন করা হয়। সেনাবাহিনীর মেজর পদমর্যাদার

অফিসারদের ক্যাম্প কমান্ড্যান্ট নিযুক্ত করা হয়। উদ্দেশ্যে ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের এক জায়গায় জড়ো করে একটি সুষ্ঠু তালিকা তৈরি করা এবং তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নির্ধারণ করা। মিলিশিয়া ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিদিন নির্দিষ্টহারে ভাতা প্রদান করা হতো। কিছুদিন যেতে না যেতেই উচ্চপদস্থ আমলারা সরকারকে বোঝাল যে, ক্যাম্পগুলো এভাবে দীর্ঘদিন চলতে থাকলে সরকারের পক্ষে অর্থ জোগান দেওয়া সম্ভব হবে না। বিষয়টি সুরাহাকল্পে তৎকালীন স্বরাষ্ট্র সচিব তসলিম আহমেদের দফতরে ১৯৭২ সালের এপ্রিল কিংবা মে মাসের দিকে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সব মিলিশিয়া ক্যাম্প বন্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই সময়কার কিছু সিনিয়র রাজনৈতিক নেতাও সভায় উপস্থিত ছিলেন। স্বরাষ্ট্র সচিব তার বক্তব্যের এক পর্যায়ে জোরালো কণ্ঠে বলেন, 'State can no longer bear this burden' সভায় উপস্থিত সিনিয়র নেতা-ব্যক্তিবর্গ, যাদের মধ্যে মোটামুটি সবই মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন তারা তেমন জোরালো কোনো প্রতিবাদ করলেন না। আমি তখন কেবল চাকরিতে যোগদান করেছি। উপস্থিত সিনিয়রদের সামনে আমার কিছু বলা সমীচীন হবে কিনা ভেবে পাচ্ছিলাম না। তবু শেষপর্যন্ত কিছু বলার জন্য হাত তুললাম। অনুমতি পেয়ে সংক্ষেপে বললাম, 'যারা মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করলো– স্বাধীনতার তিন মাস যেতে না যেতেই তারা সেই দেশের জন্যই Burden হয়ে গেল? এ কেমন সিদ্ধান্ত? যা হোক, আমার বক্তব্যকে কেউ গুরুত্বসহকারে বিবেচনায় নিলেন না। ক্যাম্প বন্ধের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সমাজে চরম বিপর্যয় নেমে আসে। যারা নিজের জীবনের কথা না ভেবে দেশমাতৃকার জন্য হাতে অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করেছিল সেই মুক্তিযোদ্ধাদের অনেকে বিপথগামী হয়। বিভিন্ন অসামাজিক কাজ, চরমপন্থি রাজনৈতিক সংগঠন, সর্বহারা এবং জাসদের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে।

এ প্রসঙ্গে আমার একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। ক্যাম্প বন্ধ করার সিদ্ধান্তের পর মাদারীপুর জেলার মিলিশিয়া ক্যাম্পের কমান্ড্যান্ট মেজর মোস্তাফিজুর রহমানকে একটি কামরায় তালাবদ্ধ করে ক্যাম্পের সব মুক্তিযোদ্ধা সেখানে অবস্থা নেন। যাদের কাছে জমা না দেওয়া অবৈধ অস্ত্র ছিল তারা সেগুলো নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে এবং মিলিশিয়া ক্যাম্প বন্ধের হঠকারী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানায়। উল্লেখ্য, মেজর মোস্তাফিজুর রহমান পরবর্তীতে সেনাপ্রধান হয়েছিলেন।

স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং প্রশাসনের কর্মকর্তারা বিক্ষুব্ধ মুক্তিযোদ্ধাদের নিবৃত্ত করতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হওয়ায় ঢাকা থেকে আমাকে মাদারীপুরে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কারণ, আমি তাদের সহযোদ্ধা ছিলাম।

আমাকে গণভবনে ডেকে পাঠানো হলে আমি সেখানে উপস্থিত হই। তারপর বঙ্গবন্ধু বিস্তারিত খুলে বলেন। আরও বলেন, 'তুমি তাড়াতাড়ি মাদারীপুরে চলে যাও এবং বিষয়টির সন্তোষজনক সমাধানের চেষ্টা কর। আমি বঙ্গবন্ধুকে বললাম, ওখানে গিয়ে বিক্ষুব্ধ মুক্তিযোদ্ধাদের আমি কী বলব? কীভাবে তাদের প্রতিবাদ প্রশমিত করব? বঙ্গবন্ধু বললেন, 'তাহলে কি করা যায়?' আমি বললাম, ওদের অন্তত ৫০০ লোকের চাকরির ব্যবস্থা করে দেন, যেন আমি তাদের কাছে গিয়ে কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি দিতে পারি। বঙ্গবন্ধু বললেন, 'দেশের এই নাজুক পরিস্থিতিতে কীভাবে ৫০০ লোকের চাকরির ব্যবস্থা করবো? তুমি বরং ৩০০-৩৫০ লোকের জন্য চাকরির ওয়াদা করতে পার।'

বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ মোতাবেক আমি মাদারীপুর যাই এবং বিক্ষুব্ধ সবার উদ্দেশে বলি, বঙ্গবন্ধু আমাকে ক্ষমতা দিয়ে এখানে পাঠিয়েছেন। তোমরা শান্ত হও, কার কী দাবি-দাওয়া আছে, কারা চাকরি করতে চাও তাদের একটা লিস্ট আমাকে দাও। আমি তাদের কথা মনোযোগসহকারে শুনলাম। মোস্তাফিজুর রহমান সাহেবকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করলাম। আমি কিছুটা আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলাম, কারণ এত লোকের মধ্যে চাকরি করতে ইচ্ছুক মাত্র ২৩০ জনের একটি লিস্ট আমাকে দিয়েছিল। বাকিরা স্ব স্ব পেশায় ফিরে গেল। কেউ পড়াশোনা করতে, কেউ ব্যবসা করতে, কেউ কৃষি কাজে। যে কারণে ঘটনাটি উল্লেখ করলাম তা হচ্ছে, যদি এরকম অপরিকল্পিতভাবে মিলিশিয়া ক্যাম্পগুলো বন্ধ না করে সুপরিকল্পিতভাবে তাদের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা যেত, তাহলে অনেকেই বিপথগামী হতো না। সমাজে বিশৃঙ্খল পরিবেশের সৃষ্টি হতো না। সর্বোপরি, মুক্তিযোদ্ধাদের সঠিক মূল্যায়ন করা যেত। যা আজপর্যন্ত যথাযথভাবে করা যায়নি বা করা হয়নি। এখনো কে মুক্তিযোদ্ধা আর কে মুক্তিযোদ্ধা নয়, তা নিয়ে বিব্রতকর অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। দেশে সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকাও বদলে যায়। স্বাধীনতার ৪০ বছর পরও আমরা মুক্তিযোদ্ধাদের একটি সঠিক তালিকা তৈরি করতে পারিনি। তাদের প্রাপ্য মর্যাদাটুকু দিতে পারিনি। জাতি হিসেবে এর চেয়ে বড় লজ্জার আর কী হতে পারে।

যুদ্ধ শেষে সাহসী ও বীরত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য খেতাব দেওয়ার সিদ্ধান্ত হলো। বীরশ্রেষ্ঠ, বীর উত্তম, বীর বিক্রম, বীর প্রতীক। খেতাব প্রাপ্তি শুধু সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল। অবশ্য এর বাইরে দু-একটি ব্যতিক্রম রয়েছে মাত্র। কারণ বিভিন্ন সেক্টর কমান্ডারদের সুপারিশকেই আসল মানদণ্ড বা মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। অথচ ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের অনেক পূর্বেই যারা স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য জাতিকে প্রস্তুত করতে ব্যস্ত ছিলেন, সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য ত্যাগী কর্মীবাহিনী সংগঠনের দায়িত্ব পালন করল, যে মুজিবনগর সরকারের সার্থক নেতৃত্বে সমগ্র যুদ্ধ পরিচালিত হলো, হাজার হাজার ছাত্র শ্রমিক কৃষক মজুর জীবন বাজি রেখে সম্মুখযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল, শহীদ হলো, সীমাহীন বঞ্চনার শিকার হলো– যুদ্ধ শেষে যখন খেতাব প্রদানের প্রশ্ন উঠল, তাদের কথা সবাই বেমালুম ভুলেই গেল। allantry award তো দূরের কথা। তাদের অবদানের স্বীকৃতির জন্য একটি বেসামরিক খেতাব প্রদানের ব্যবস্থাও হলো না। আজও হয়নি। ভবিষ্যতে কোনোদিন হবে বলেও মনে হয় না।

রক্ষীবাহিনীর অজানা অধ্যায়- ৪

একদিন আমি আর বন্ধু আনোয়ারুল আলম (শহীদ) দুজনে এক আত্মীয়ের বাসায় যাব বলে গাড়িতে রওনা দিয়েছি। শহীদ গাড়ি চালাচ্ছিল। হঠাৎ সে ৩২ নম্বর বাড়িতে গাড়ি ঢুকিয়ে দিল। আমি বললাম, আমরা এখানে কেন এসেছি। শহীদ বলল, বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে একটু দেখা করে যাই। আমি বললাম, তাকে কিন্তু আগের মতো ভাবলে চলবে না। আগে ছিলেন আমাদের মুজিব ভাই। এখন তিনি বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট। যখন-তখন তার কাছে যাওয়া উচিত নয়। যা হোক আমরা গেলাম। সেখানে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে খন্দকার মোশতাকসহ আরও কয়েকজন বসা ছিলেন। বঙ্গবন্ধু আমাদের দেখে জিজ্ঞেস করলেন, তোরা কি কোনো কাজে এসেছিস? বললাম, জি-না, আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলাম। তিনি আমাদের মিষ্টি দিতে বললেন। আমরা একটু দূরে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ বঙ্গবন্ধু মোশতাক সাহেবের মাথার টুপিটা খুলে ফেললেন। খালি মাথায় তাকে শিম্পাঞ্জির মতো লাগছিল। তারপর সবার উদ্দেশে বঙ্গবন্ধু বললেন, এই যে মাথাটা দেখছ, এটা কিন্তু যেই সেই মাথা না। যদি লোহার পেরেক ঢুকাও ঢুকবে। কিন্তু মাথার মধ্যে এত মুরি প্যাঁচ যে সেই পেরেক আর বের করতে পারবে না। আমি এখানে বোঝাতে চেয়েছি বঙ্গবন্ধু এমনভাবে মোশতাককে চিনতেন। তারপরও নিজের নিরাপত্তার ব্যাপারে বরাবরই উদাসীন ছিলেন। তার ওই একই কথা, পাকিস্তানিরা আমাকে মারতে পারেনি। আমার দেশের সোনার ছেলেরা আমাকে মারবে?

বিপ্লবের সময় যদি স্বয়ং উপস্থিত থেকে নেতৃত্ব না দেওয়া যায় তাহলে ওই শূন্যতা পূরণ করা কষ্টসাধ্য। কিউবার দিকে নজর দিলেই দেখা যায়, ফিদেল কাস্ত্রো অসুস্থ হওয়া পর্যন্ত দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতায় ছিলেন। বলা চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পেটের মধ্যে থেকেও তিনি সমাজতন্ত্রকে টিকিয়ে

রেখেছেন। কাস্ত্রো স্বয়ং বিপ্লবের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বলে তিনি প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে পেরেছিলেন এবং প্রতিবিপ্লবীদের দমন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। জনগণ এবং তার মধ্যে কোনো দূরত্ব ছিল না। তাদের চাওয়া-পাওয়া বুঝতেন। শুনেছি, ফিদেল কাস্ত্রো নাকি বঙ্গবন্ধুকে আরও সতর্ক হওয়ার জন্য বলেছিলেন। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বলেছিলেন, 'প্রতিবিপ্লবীরা সব সময় ওঁৎ পেতে থাকে।' যে কোনো কারণেই হোক বঙ্গবন্ধু এ কথাগুলো সিরিয়াসলি নেননি।

ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ব্যাপারে বঙ্গবন্ধু সব সময় স্বভাব-সুলভ উদাসীন ছিলেন। তবুও বঙ্গবন্ধুকে আমরা বেশ কয়েকবার বলেছি, বঙ্গবন্ধু, আমাদের কিন্তু অনেক বদনাম আছে। রক্ষীবাহিনীকে আপনার প্রাইভেট বাহিনী বলা হয়। আপনার নিরাপত্তার দায়িত্বটা আমাদের দিন। বঙ্গবন্ধু প্রতিবারই বলেছেন, 'এই দায়িত্বটা তো পুলিশ ও সেনাবাহিনীর, এটা রক্ষীবাহিনীর নয়।' তিনি অতিশয় আত্মবিশ্বাসী ছিলেন। বাঙালিরা যে তার ক্ষতি করতে পারে, সেটা তিনি ভাবতেও পারতেন না। এর মধ্যে হঠাৎ একদিন স্পেশাল ব্রাঞ্চের একটি তথ্যের ভিত্তিতে বঙ্গবন্ধুর ৩২ নম্বর বাড়ির নিরাপত্তা বিধান করা জরুরি হয়ে পড়ল। স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডিআইজি ই.এ চৌধুরী, রক্ষীবাহিনীর পরিচালক ব্রিগেডিয়ার নূরুজ্জামান, আমি, আনোয়ারুল আলম (শহীদ), ঢাকার এসপি মাহবুব সাহেব একটা বেসরকারি নিরাপত্তা বিধানের চিন্তাভাবনা করি। সেই অনুযায়ী রক্ষীবাহিনীকে ৩২ নম্বর বাড়ির আশপাশে মোতায়েন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কিন্তু বিষয়টি সম্পন্ন করতে হবে সম্পূর্ণ গোপনীয়তার মাধ্যমে। কারণ বঙ্গবন্ধু জানলে এটি তিনি করতে দেবেন না। আমি এবং আনোয়ারুল আলম (শহীদ) ৩২ নম্বর বাড়ির আশপাশে কোথায় রক্ষীবাহিনীর সদস্যদের রাখা যায় এমন একটি জায়গা খোঁজ করছিলাম। কোথাও রাখার মতো ব্যবস্থা হলো না। শেষপর্যন্ত আমরা বঙ্গবন্ধুর বাড়ির সামনে ব্রিজের ওপারে শেখ ফজলুল হক মণি ভাইয়ের বাসার সম্মুখে লেকের পাশে একটি জায়গা পাই। জায়গাটি আবার কাঁটাতার দিয়ে ঘেরাও করা ছিল। আমরা কাঁটাতার কেটে সেখানেই বাহিনী রাখার বন্দোবস্ত করি। এ বিষয়টি কাউকে জানানো হয়নি। সারারাত থাকার পরে খুব ভোরে আমরা বাহিনী প্রত্যাহার করে চলে আসি। কিন্তু বিপদ ঘটল অন্যভাবে। মণি ভাইয়ের বাসার কোনো এক লোক আমাদের ওই অবস্থান দেখে মণি ভাইকে বলে দিয়েছিল। পরবর্তীতে বিষয়টি অন্যধারায় প্রবাহিত হলো। জানান হলো, তোফায়েল আহমেদ

রক্ষীবাহিনীকে দিয়ে শেখ ফজলুল হক মণিকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছেন। আমরা মহাবিপদে পড়ে গেলাম। আমি এবং আনোয়ারুল আলম (শহীদ) মণি ভাইয়ের অফিসে গিয়ে বিস্তারিতভাবে ঘটনাটি খুলে বলি। আরও বলি, আমি ও শহীদ ওখানে ছিলাম। তখন তিনি বলেন, তোরা আমাকে জানাসনি কেন? উত্তরে আমরা বললাম, মণি ভাই, আমরা বঙ্গবন্ধুকেও জানাইনি। তারপর তিনি বিষয়টি বুঝতে পেরে এ নিয়ে আর কোনো কথা বলেননি। এ ঘটনার পরপরই আমাদের ৩২ নম্বর বাড়ির নিরাপত্তা নিয়ে দুশ্চিন্তা শুরু হলো। ভাবলাম, বঙ্গবন্ধুকে বিষয়টি বুঝিয়ে বলতে হবে। ৩২ নম্বর বাড়িতে বঙ্গবন্ধুর অবস্থান কোনোভাবেই নিরাপদ নয়। আমি, ব্রিগেডিয়ার নূরুজ্জামান, ব্রিগেডিয়ার সাবিহ্ উদ্দিন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করার জন্য গণভবনে যাই। সেখানে ব্রিগেডিয়ার সাবিহ্ উদ্দিন গণভবন এবং ৩২ নম্বরের নিরাপত্তার বিষয়টি বঙ্গবন্ধুকে বুঝিয়ে বলেন। আর অনুরোধ করে বলেন, আপনার কোনোমতেই ৩২ নম্বর বাড়িতে অবস্থান করা উচিত নয়। গণভবন সব দিক থেকে সুরক্ষিত এবং আরেকটি সুবিধা হলো রক্ষীবাহিনীর হেড কোয়ার্টারও এর পাশে। প্রয়োজনে আমরা একটি গোপন পথেরও সৃষ্টি করতে পারি।

ব্রিগেডিয়ার সাবিহ্ উদ্দিন তার সঙ্গে একটি বই নিয়েছিলেন। বইটির নাম 'A man on the Horse Back' যাতে দুনিয়ার প্রায় শ'খানেক মিলিটারি ক্যু'র ঘটনা ছিল। তিনি বঙ্গবন্ধুকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে, অতি অল্পসংখ্যক লোকও কীভাবে ক্যু করতে পারে। এর বহু তথ্য-প্রমাণ বঙ্গবন্ধুকে বলা হলো। সব কথা শোনার পর বঙ্গবন্ধুর একই উত্তর ছিল– বাংলার মানুষ আমাকে মারবে? তোমরা তোমাদের রক্ষীবাহিনী ঠিকমতো চালাও। আমার নিরাপত্তা নিয়ে তোমাদের ভাবতে হবে না।

রক্ষীবাহিনীর অজানা অধ্যায়- ৫

আরেকটি ঘটনা মনে পড়ে। জাসদের মিটিং বায়তুল মোকাররমের সামনে। তারা সেখানে বিক্ষুব্ধভাবে অবস্থান নিয়েছে। বঙ্গবন্ধু বিষয়টি জানার পর আমাকে গণভবনে ডেকে পাঠানো হলো। আমি গিয়ে দেখলাম তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত। আমাকে বললেন, 'দেখ আমি এসব আর সহ্য করব না। Go and sort it out (যাও এবং বিষয়টি সামলানোর ব্যবস্থা কর)। এভাবে একটি দেশ চলতে পারে না। যার যা খুশি তাই করবে? এভাবে চলতে পারে না। তোমরা যেভাবে পার ম্যানেজ কর। আমি তাকে সালাম দিয়ে বের হয়ে গাড়িতে উঠতে যাব, তখন বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত মহিউদ্দিন এসে আমাকে বললেন, বঙ্গবন্ধু আপনাকে ডাকছেন। বললাম, এইমাত্র তার রুম থেকে আমি কথা বলে বের হয়ে এসেছি। তিনি বললেন, আবারও ডাকছেন। আমি আবার গিয়ে বঙ্গবন্ধুর রুমে প্রবেশ করে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত একজন লোকের চেহারা দেখতে পেলাম। আমাকে বললেন, 'শোন, আমার দেশের মানুষ ব্রিটিশের জুতা খেয়েছে। পাকিস্তানের জুতা খেয়েছে। আমি মুজিবুর রহমান, এখন দেশের ক্ষমতায়। আমার আমলেও যদি অত্যাচারিত হয় তাহলে ওরা যাবে কোথায়? সুতরাং যাও- নো ফায়ারিং, ম্যানেজ ইট ট্যাক্টফুলি। একটু আগে রাগান্বিত হয়ে নির্দেশ দিলেন দমন করার। পরক্ষণেই চিন্তা করলেন অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনতে গিয়ে রক্ষীবাহিনী যদি কঠোর পদক্ষেপ নেয়, সে জন্য সঙ্গে সঙ্গে আবার আমাকে ডেকে বুঝিয়ে দিলেন। অনেকেই তার এই দুর্বলতাটাকে নানাভাবে ব্যবহার করেছে।

আরেকটি ব্যাপার আমার মনে হয়, মুক্তিযুদ্ধের সময় বঙ্গবন্ধু যেহেতু বন্দী অবস্থায় পাকিস্তানে ছিলেন- তার এই অনুপস্থিতির ফায়দা অনেকে নেওয়ার চেষ্টা করতেন। বিশেষভাবে অনেক সিনিয়র নেতা বঙ্গবন্ধু কিছু করতে গেলেই কিংবা কোনো সিদ্ধান্ত নিতে চাইলেই এসব সুযোগ সন্ধানী

ব্যক্তি তাকে ভুলপথে নেওয়ার চেষ্টা করতেন। যুদ্ধের সময় বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতির জন্য যে ইনফরমেশন গ্যাপ সৃষ্টি হয়েছিল অনেক নেতাই বিষয়টিকে তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহারের চেষ্টা করতেন। অবশ্য পরে তিনি এ ব্যাপারগুলো উপলব্ধি করতে পেরে আস্তে আস্তে কঠোর হচ্ছিলেন। দলের এমপি এবং নেতাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশও দিয়েছিলেন। যদিও কোনো পদক্ষেপ গ্রহণের আগে তিনি শাহাদাৎবরণ করেন।

বাকশাল প্রতিষ্ঠা : অনেকের ধারণা, বঙ্গবন্ধু কঠোর হাতে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে একদলীয় শাসন ব্যবস্থায় বাকশাল গঠন করেছিলেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালে যদি বাকশাল প্রতিষ্ঠা করতেন, তাহলে কারও মনে কোনো প্রশ্ন থাকত না। সবাই মনে করতেন মানুষের মঙ্গলের জন্যই বাকশাল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কারণ সদ্যস্বাধীন দেশে মানুষের মন-মানসিকতা তখন অন্যরকম ছিল। কিন্তু '৭৫ সালে এসে বাকশাল প্রতিষ্ঠাকে দেশের মানুষ বিশেষভাবে রাজনীতিবিদ বা সুশীলসমাজের লোকজন ক্ষমতা দীর্ঘায়িত করার জন্য সাধারণ মানুষের ওপর একটি অগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়ার পদক্ষেপ হিসেবে মনে করল। বঙ্গবন্ধু সারাজীবন সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাস করতেন। সুতরাং তার বাকশাল প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপকে অনেকেই দেশি-বিদেশি কায়েমি স্বার্থবাদীদের, বিশেষভাবে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় বিশ্বাসীদের প্রচেষ্টার পরিণাম হিসেবে মনে করে।

১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে বলেছিলেন, 'বাংলাদেশ East-এর সুইজারল্যান্ড।' এই মনোবাসনা তার মধ্যে সব সময় কাজ করত। কিন্তু দেশের পরিস্থিতি ক্রমশই ঘোলাটে হতে থাকে। '৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ, বিভিন্ন জায়গায় সর্বহারা ও তদ্রূপ অনেকগুলো বাহিনী মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। জাসদের উগ্রপন্থি রাজনৈতিক আচরণ, সিরাজ সিকদারের সর্বহারা পার্টির চরমপন্থি কার্যকলাপ এবং তাদের মধ্যে সশস্ত্র সংগ্রামের পরিণতিতে শত শত মানুষের জীবন বিপন্ন হয়ে উঠেছিল। তারা একপ্রকার ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল।

সংসদ সদস্যরা ভয়ে তাদের নিজস্ব এলাকায় যেতে পারতেন না। তখন বঙ্গবন্ধুকে বলা হলো, এভাবে একটা দেশ চলতে পারে না। আপনি One party system চালু করেন। তা না হলে দেশের শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে রাখা কঠিন হয়ে পড়বে। তাই বঙ্গবন্ধু অনিচ্ছা সত্ত্বেও পারিপার্শ্বিক অবস্থার

পরিপ্রেক্ষিতে বাকশাল কায়েম করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এখানে আরও একটি ঘটনার কথা আমার মনে পড়ে। দিনটি ছিল রবিবার। তখন রবিবার ছিল সাপ্তাহিক ছুটির দিন। আমি বাসা থেকে গাড়ি চালিয়ে গণভবনের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম। কোনো কারণ ছাড়াই গণভবনে ঢুকে পড়লাম। গাড়ি থেকে নামার পর মনে পড়ল ছুটির দিনের কথা। আবার গাড়িতে উঠব এর মধ্যেই বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত সচিব হানিফ ভাই দেখে আমাকে ডাক দিলেন। আমি তাকে বললাম, আজ যে রবিবার বন্ধের দিন ভুলেই গিয়েছিলাম। এই বলে তার কাছ থেকে বিদায় নেব। তিনি বললেন, ভেতরে যাও বঙ্গবন্ধু আছেন। বঙ্গবন্ধু আমাকে দেখে হানিফ ভাইকে বললেন, ওর জন্য কিছু খাবারের ব্যবস্থা কর। আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে বসেছিলেন বঙ্গবন্ধু। তাকে অনেক চিন্তিত মনে হচ্ছিল। রক্ষীবাহিনীতে থাকাবস্থায় আমাদের ছিল রুটিন লাইফ। সকালে বাসা থেকে বের হতাম। দুপুরে এসে লাঞ্চ করে আবার অফিসে চলে যেতাম। বাসায় ফিরতে রাত ১০-১১টা বাজত। সেই কারণে দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি কিংবা জনগণের মনোভাব এসব দেখা বা বোঝার অতটা সময় পেতাম না।

রক্ষীবাহিনীর অজানা অধ্যায়- ৬

চাটুকার আমলারা ক্ষমতাসীনদের জন্য প্রায়ই বিব্রতকর অবস্থার সৃষ্টি করেন। বঙ্গবন্ধু কী শুনলে খুশি হবেন সেই কথাটি সাজিয়ে-গুছিয়ে তাকে বলার চেষ্টা করা হতো। একবার বঙ্গবন্ধু চট্টগ্রামে এক জনসমাবেশে যোগদানের জন্য যাবেন। সময়সূচি আগে থেকেই নির্ধারণ করা ছিল। বঙ্গবন্ধু যাতে ওই দিন চট্টগ্রামে যেতে না পারেন সে জন্য জাসদ সমর্থকরা মানিক মিয়া এভিনিউতে অবস্থান নিয়ে রাস্তা বন্ধ করে দেয়। এর সুরাহাকল্পে গণভবনে একটি সভা ডাকা হয়। সেখানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন, আর্মির পক্ষে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ, পুলিশের আইজি আর রক্ষীবাহিনীর পক্ষ থেকে আমি ছিলাম। একপর্যায়ে পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হলো We can not tolerate this. We must clear the road anyhow. দেশটাকে কি তারা মগের মুল্লুক পেয়েছে।' মোটামুটি সিদ্ধান্ত হলো যে কোনো উপায়ে ওদের হটিয়ে রাস্তা খালি করা হবে। আমি চিন্তা করলাম জাসদের নেতা-কর্মীরা সহজে পথ ছাড়বে না। জোর করলে হয়তো সমস্যা আরও ঘনীভূত হবে। এর ফলে এক অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। গণভবনের ওই মিটিংয়ে উপস্থিত সবাই আমার সিনিয়র। তারপরও আমি কিছু বলার জন্য হাত উঠালাম। বঙ্গবন্ধু জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার? বললাম, বঙ্গবন্ধু আমার একটা আর্জি আছে। আপনি অনুমতি দিলে বলতে পারি। তিনি বললেন, 'বল তোমার কী আর্জি আছে?' বললাম, বঙ্গবন্ধু আপনি জাতির জনক। সেই হিসেবে এ দেশে কারও কাছে আপনার কোনো হার নেই। আপনার চট্টগ্রাম যাওয়া দরকার। কীভাবে যাওয়া যায় সেটাই হলো আলোচ্য বিষয়। ওই রাস্তা দিয়েই যেতে হবে, এমন তো কোনো কথা নেই। তারা রাস্তা অবরোধ করে আছে, তারা তাদের মতো করতে থাকুক। আপনি অনুমতি দিলে এয়ারপোর্টের পাশ দিয়ে কাঁটাতারের

বেড়া কেটে রাস্তা বানাতে পারি, ওখান থেকে আপনি হেলিকপ্টারযোগে চট্টগ্রাম চলে যাবেন। অবরোধকারীরা রাস্তায় তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাক।

ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ আমার বক্তব্যকে জোরালোভাবে সমর্থন দিলেন। ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের অনুরোধে বঙ্গবন্ধু রাজি হলেন এবং সেই পরিকল্পনা মোতাবেক বঙ্গবন্ধু চট্টগ্রামে গেলেন। পরে আমি সিভিল ড্রেসে জাসদের মিটিংয়ে গেলাম। ওখানে আমার বন্ধু যারা ছিল তারা বলল, আমাদের কি ভয় দেখাতে এসেছো? এখান দিয়ে যেতে হলে আমাদের লাশের ওপর দিয়ে যেতে হবে। আমি বললাম, তোমরা এখানে অপেক্ষা করতে থাক চট্টগ্রাম থেকে বঙ্গবন্ধু এই পথ দিয়ে ফিরবেন। তারা ব্যাপারটা বুঝতে পারল না। বললাম, বঙ্গবন্ধু এখন চট্টগ্রামের জনসভায়। ওরা তো রীতিমতো অবাক। তা কী করে সম্ভব? আমি বললাম, বিশ্বাস না হলে গিয়ে রেডিওতে শোন। এরকম গঠনমূলক সিদ্ধান্তের ফলে একটি অবশ্যম্ভাবী দুর্ঘটনা থেকে রেহাই পাওয়া গেল। কোনো ইস্যুতে কেউ যদি বঙ্গবন্ধুকে বুঝিয়ে বলতে পারতেন, তিনি তা মেনে নিতেন।

আর একটি ঘটনা আমার মনে পড়ে, কুষ্টিয়ার একটি দুর্ঘটনাকে উপলক্ষ করে আমাকে গণভবনে ডাকা হয়েছিল। আমি বঙ্গবন্ধুর টেবিলের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। ইতোমধ্যে প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি রুহুল কুদ্দুস সাহেব তিনটি ফাইল নিয়ে বঙ্গবন্ধুর কক্ষে প্রবেশ করেন। আমি তাদের কথাবার্তার মধ্যে না থাকার জন্য প্রস্থানের অনুমতি চাইলে বঙ্গবন্ধু ইশারায় আমাকে বসতে বলেন। রুহুল কুদ্দুস সাহেব দুটি ফাইল স্বাক্ষরের জন্য বঙ্গবন্ধুর কাছে উপস্থাপন করেন। ফাইল দুটি ছিল পূর্ব পাকিস্তানের প্রাক্তন গভর্নর মোনায়েম খানের জামাতা ও প্রাক্তন মন্ত্রী ওয়াহিদুজ্জামানের ছেলের চাকরি থেকে বরখাস্তের প্রস্তাব সংবলিত।

বঙ্গবন্ধু ফাইল দুটি দেখার পরে রুহুল কুদ্দুস সাহেবের কাছে ফেরত দেন এবং বলেন, মোনায়েম খান ও ওয়াহিদুজ্জামান দুজনেই আমার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ছিল, এ কথা ঠিক। কিন্তু তাই বলে আমার হাতে তাদের ছেলেদের কোনো ক্ষতি হবে এটা কোনোমতেই কাম্য হতে পারে না। আপনি ফাইল দুটি নিয়ে যান। আর কখনো আমার কাছে পাঠাবেন না। এরপর তৃতীয় ফাইলটি বঙ্গবন্ধুর স্বাক্ষরের জন্য উপস্থাপন করেন। সেটি ছিল একটি প্রজেক্ট অনুমোদনের ফাইল। বঙ্গবন্ধু তাকে বললেন, 'ফাইলটা রাখেন'। কিছুক্ষণ পর রুহুল কুদ্দুস সাহেব আবারও ফাইলে সই করতে বলেন। উত্তরে বঙ্গবন্ধু বললেন, আপনি ফাইলটি রেখে যান। আমি

সই করে পাঠিয়ে দেব। রুহুল কুদ্দুস সাহেব চলে যাওয়ার পর বঙ্গবন্ধু তার যুগ্ম সচিব মনোয়ার সাহেবকে ডাকলেন এবং বললেন, 'দেখ তো মনোয়ার এই ফাইলে সই করা যায় কিনা?' মনোয়ার সাহেব ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ সরকারি কর্মকর্তা। তিনি ফাইলটি পড়ে বললেন, না স্যার, এই ফাইলে আপনার সই করা উচিত হবে না। বঙ্গবন্ধু বললেন, 'তাহলে কী করা যায় বল তো? তোর প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি সাহেবই তো ফাইলটা নিয়ে এসেছেন। তার ফাইলে সই না করে ফেরত দেওয়াটাও ভালো দেখায় না। মনোয়ার সাহেব বললেন, 'স্যার, ফাইলের উপরে লিখে দেন, 'পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মতামতের জন্য প্রেরণ করা হোক।' বঙ্গবন্ধু আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দেখছিস, সিএসপিদের বুদ্ধি।' মনোয়ার সাহেবের পরামর্শ অনুযায়ী তাই করা হলো। প্রশাসনিক ব্যাপারে এরকম সিদ্ধান্ত তিনি নিতেন কিংবা তাকে বুঝালেও তিনি বুঝতেন।

রক্ষীবাহিনী গঠনের কিছুদিন পরের কথা। আমি আর আনোয়ারুল আলম (শহীদ) কী কাজে যেন গিয়েছি। বঙ্গবন্ধু তখন বলছিলেন, 'দেশ তো তাজউদ্দীনরাই চালাবে। আমি দেশ চালানোর দায়িত্ব নিতে চাই না। তোরা স্মৃতিসৌধের পাশে আমার জন্য একটি বাড়ির জায়গা দেখিস, যেখানে বসে আমি স্মৃতিসৌধকে প্রাণভরে দেখতে পারি।

প্রথমে তার এরকমই চিন্তা-ভাবনা ছিল। কিন্তু যখন তাকে বুঝানো হলো যে, বঙ্গবন্ধু আপনি ছাড়া দেশ চলবে না। আপনি ছাড়া কেউ কন্ট্রোল করতে পারবে না। আপনি যাদের হাতে দেশের দায়িত্ব তুলে দিতে চাচ্ছেন, এরা মুক্তিযুদ্ধের সময় কী করেছে আপনি তো দেখেননি? এটা-ওটা আরও কত রকম বুঝাতে থাকে। বঙ্গবন্ধু ক্ষমতায় থাকলে তারা তোষামোদী করে স্বার্থ উদ্ধার করতে পারবে। তাজউদ্দীন সাহেব ক্ষমতায় থাকলে এতটা তোষামোদী করা যাবে না। এই চাটুকারদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে দেওয়া বিভিন্ন তথ্য এবং উপদেশের ফলশ্রুতিতে বঙ্গবন্ধুর আজীবনের রাজনৈতিক সাথী তাজউদ্দীন আহমদ সাহেবের সঙ্গে বিরূপ সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। এক সময় তাজউদ্দীন আহমদকে মন্ত্রিত্ব থেকে বাদ দেওয়া হয়।

রক্ষীবাহিনীর অজানা অধ্যায়- ৭

বঙ্গবন্ধু তখন চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে ছিলেন। পল্টন ময়দানের একটি জনসভায় মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী সরকারের কর্মকাণ্ডের কঠোর সমালোচনা করেন এবং অনেক গরম গরম বক্তৃতা করেন। তারপর ভাসানী সাহেবের নেতৃত্বে একটি ভুখা মিছিল প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের দিকে আসে। তখন তাজউদ্দিন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলামসহ অন্য নেতারা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে উপস্থিত ছিলেন। নিরাপত্তা সংস্থার প্রতিনিধিদের ডেকে কীভাবে বিষয়টি সামাল দেওয়া যায় সে ব্যাপারে আলোচনা করা হলো। সরকারের ভয় ছিল যদি ভুখা মিছিল নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এসে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার সৃষ্টি করে, তাহলে কী ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে? আমরা সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেব, তাজউদ্দিন সাহেবকে আশ্বস্ত করে বললাম, এ বিষয়টি নিয়ে এত উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। ভাসানী সাহেব একজন বর্ষীয়ান জননেতা হিসেবে তার প্রাপ্য সম্মান তাকে দেওয়া হবে। রক্ষীবাহিনীর একটি প্লাটুন লাইন করে দাঁড় করানো হলো তাকে রাষ্ট্রপতির গার্ড অব অনার প্রদর্শনের জন্য। সবাই চিন্তিত ভাসানী সাহেব এসে কী না কী করে বসেন? ভাসানী সাহেব এলেন। আমি আর এসপি মাহবুব সাহেব গিয়ে তাকে স্যালুট দিয়ে ভেতরে নিয়ে এলাম। ভাসানী সাহেবকে রাষ্ট্রপতির গার্ড অব অনার প্রদান করা হলো। পল্টনে গালিগালাজ করে এখানে এসে রক্ষীবাহিনীর সদস্যদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, বাবারা তোমরাই তো দেশের ভবিষ্যৎ। তারপর এসে বসলেন। আমার বন্ধু আনোয়ার উল আলম শহীদ হানিফ ভাইকে বলল মিষ্টি ও অন্যান্য খবার-দাবারের ব্যবস্থা করতে। আসন গ্রহণের পরে মওলানা সাহেবকে মিষ্টি এবং বিভিন্ন প্রকার খাবার-দাবার পরিবেশন করা হলো। খোলা মনের মানুষ ছিলেন মওলানা সাহেব। তাই সরল মনে তিনি

পরিবেশিত খাবার গ্রহণ করলেন। তারা কিন্তু এসেছিলেন ভুখা মিছিল নিয়ে। ক্যামেরাম্যানরাও সুযোগ পেয়ে ছবি তুলতে শুরু করে। পরের দিন পত্রিকায় ছাপা হয় বাইরে ভুখা মিছিল, ভেতরে মিষ্টিমুখ।

যা হোক, তারপর তাজউদ্দিন আহমদ কয়েকটা ফাইল ভাসানী সাহেবের সামনে দিয়ে বললেন, হুজুর এই রইল কাগজপত্র, আপনি দেশ চালান। ভাসানী সাহেব বললেন, না তাজউদ্দিন দেশ তো তোমরাই চালাবে। তাজউদ্দিন সাহেব বললেন, 'আমরা কীভাবে চালাব, আপনি যদি এরকম করেন? আমাদের দেশ চালানো দরকার নেই, আমরা চলে যাই। আপনিই চালান। সদ্যস্বাধীন আমাদের এই দেশ। কত সমস্যা আছে আপনি জানেন না? ভাসানী সাহেব তখন একটি অত্যন্ত মূল্যবান কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, 'তাজউদ্দিন কাউকে না কাউকে তো কিছু করতে হবে, বলতে হবে। এখন আমি বলছি। আমি যদি না বলি, অন্যরা যদি বলে, কিংবা ক্যান্টনমেন্ট থেকে যদি বলে সেটা তোমাদের জন্য কি মঙ্গলজনক হবে? মওলানা সাহেবের এই কথাটা সব সময় আমার মনে পড়ে। মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা এমনিতে আসে না, এটা অর্জন করতে হয়। স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় সরল মনে কাজ করেছেন। সব সময় নিঃস্বার্থভাবে মানুষের কল্যাণে ব্রতী ছিলেন। দেশের সংকটকালে এসব নেতার যে কত প্রয়োজন এখন তা আমরা উপলব্ধি করছি।

সিরাজ শিকদার অধ্যায়

লৌহজং থানা সিরাজ শিকদার তিন তিনবার লুট করেছে। ওটা ছিল সর্বহারা পার্টির Red area। ওই থানার শামুরভাঙ্গা গ্রামের প্রায় সবাই সর্বহারা পার্টির সদস্য ছিল। সর্বহারাদের হাতে রক্ষীবাহিনীর একজন অফিসার মারা যাওয়ার পর পুলিশ এবং রক্ষীবাহিনী যৌথভাবে লৌহজং থানায় অভিযান পরিচালনা করে। পুরো এলাকার কেউ কোনো কথা বলে না। বিভিন্ন লোককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এর মধ্যে একজন ছিল নৌকায় মাঝি। সন্দেহবশত তাকে ধরে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করে দেখা গেল উনি পার্টির একজন উঁচুমাপের নেতা এবং সিরাজ শিকদারের নিকটতম সহকর্মী। পেশায় তিনি একজন ইঞ্জিনিয়ার। মাথায় গামছা বেঁধে মাঝির বেশ ধরে নৌকা চালিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। এই মাঝি লোকটাকে ঢাকায় নিয়ে এসে জিজ্ঞাসাবাদ করা শুরু হলো। প্রথম অবস্থায় সে কোনো কথাই বলতে চায়নি। একপর্যায়ে ওই লোকটাকে বলা হলো,

সত্যি কথা বললে তার নিরাপত্তার গ্যারান্টি সরকার দেবে। সে বলল, আপনারা পারবেন না। আমি আজ মুখ খুললে কাল মারা যাবো। বিভিন্নভাবে তাকে বোঝানোর পর এক সময় বলা হলো, তুমি যা জানো সব যদি সত্যি করে বলো, তাহলে তোমাকে তোমার ফ্যামিলিসহ নিরাপদে বিদেশ পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা সরকার করবে। এক সময় সে মুখ খুলল এবং সব বলে দিল। এই সূত্র ধরে ঢাকায় যে তাদের কমান্ডার ছিল, সে ধরা পড়ে। তারও একই অবস্থা। মুখ খুলছে না। তারপর তাকেও বুঝানো হলো। বিদেশ পাঠানোর কথা বলা হলো। তারপর সেও একপর্যায়ে গোপন তথ্য ফাঁস করে দিল। এর পর সিরাজ শিকদারের প্রতিটি গতিবিধির ওপর গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরা ২৪ ঘণ্টা নজর রাখতে শুরু করে।

ওই সময় সিরাজ শিকদারের সর্বহারা পার্টির মধ্যে অনেক অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। পার্টির অনেক নেতা সরকারের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে গ্রেফতার বরণ করে। এক কথায় বলা যায়, সর্বহারা পার্টির একটি মারাত্মক দুঃসময় চলছিল। গ্রেফতার হওয়া নেতারা গোয়েন্দা বিভাগের কাছে সিরাজ শিকদার এবং তার সহযোগীদের সম্পর্কে অনেক তথ্য প্রদান করে। দলের বেহাল অবস্থার কারণে এবং যেহেতু সে চৈনিকপন্থি সমাজতন্ত্রের বিশ্বাসী ছিল, তাই দেশ ত্যাগ করে চীনে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। গোয়েন্দা তথ্য অনুযায়ী তাকে কমলাপুর রেলস্টেশনে গ্রেফতার করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। কিন্তু সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে সে চট্টগ্রাম চলে যায়। শুনেছি, পার্টির পরবর্তী কর্মসূচি ঠিক করার জন্য চট্টগ্রামের একটি বাড়িতে সহকর্মীদের নিয়ে একটি সভা ডেকেছিল। উদ্দেশ্য ছিল প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদানের পরে ওখান থেকে বার্মা হয়ে চীনে গমন করবে। সভা শেষে রাস্তায় বেরিয়ে কয়েকজন পুলিশ সদস্যকে দেখে সে তড়িঘড়ি করে পালানোর চেষ্টা করে। কিন্তু তার গতিবিধি দেখে পুলিশের সন্দেহ হয় এবং তার পিছু ধাওয়া করে তাকে গ্রেফতার করে চট্টগ্রাম ডাবলমুরিং থানায় আনা হয় এবং পরে ঢাকা থেকে গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন গিয়ে তাকে বিশেষ ব্যবস্থায় ঢাকায় নিয়ে আসে। নিরাপত্তার কথা বলে তাকে রক্ষীবাহিনীর সদর দফতরে অফিসার্স মেসে রেখে জিজ্ঞাসাবাদের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

সেদিন ছিল ছুটির দিন। আমি অফিসের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি ব্রিগেডিয়ার নুরুজ্জামানের রুমের সামনে সবুজ বাতি জ্বলছে। চিন্তা করলাম আজ ছুটির দিন নুরুজ্জামান সাহেব অফিসে কী করছেন? ড্রাইভারকে অফিসের মধ্যে গাড়ি ঢুকাতে বললাম। গিয়ে দেখি সেখানে

আনোয়ারুল আলম (শহীদ)ও রয়েছে। তারা আমাকে বিস্তারিত খুলে বললো। জিজ্ঞাসা করলাম, আমাদের এখানে আনা হলো কেন? পুলিশ আছে, গোয়েন্দা আছে তাদের ওখানে নিয়ে যাক। বলল, পুলিশের কাছ থেকে সর্বহারার লোকেরা ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারে সেই ভয়ে এখানে রেখেছে। ব্রিগেডিয়ার সাবিহউদ্দিন, শহীদ এবং আমি সেখানে গেলাম। গিয়ে দেখি লোকটাকে হাত বেঁধে মেঝেতে ফেলে রাখা হয়েছে। পুলিশের সিনিয়র অফিসাররা আছে, আর্মির লোকজনও আছে। ওই অবস্থায় দেখে আমাদের রিঅ্যাকশন হলো– 'এই লোকটার নাম শুনলে অনেক মানুষের আহার নিদ্রা বন্ধ হয়ে যেত। তাকে রক্ষীবাহিনীর অফিসে এনে এভাবে বেঁধে রাখা হয়েছে কেন?' আমরা তার হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করলাম। একটি চেয়ার এনে তাকে বসতে দেওয়া হলো।

তাকে বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো কিন্তু সে কিছুই স্বীকার করছিল না। চেহারা মিলিয়ে সবাই ধরে নিয়েছিল এই লোকটিই সিরাজ শিকদার হবে। অবশেষে গোয়েন্দা বিভাগ তাদের বিশেষ সোর্সের মাধ্যমে তার পরিচয় নিশ্চিত করে। আমাদের ইচ্ছা ছিল তার কাছ থেকে একটি ঘোষণা আদায় করে গঠনমূলক কোনো সমাধানে পৌঁছানো যায় কি-না। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কী চান? আমাদের কাছে বলুন। সরকারের সঙ্গে একটা চুক্তিতে আসুন এবং আপনার পার্টির যারা সমর্থক আছে তাদের আত্মসমর্পণ করতে বলুন। আপনি যেহেতু একটি আদর্শে বিশ্বাস করেন, তাই একটি রাজনৈতিক প্লাটফরম তৈরি করুন। গুপ্তহত্যা, খুন, রাহাজানি, ত্রাস কায়েম না করে সরকারের সঙ্গে চুক্তি করে রাজনৈতিক দল গঠন করুন। আপনি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে চাইলে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তারা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন। একটা সুষ্ঠু সমাধানে আসুন, দেশের জন্যও এটা মঙ্গলজনক হবে।

আমাদের উদ্দেশ্য ছিল বন্দী অবস্থায় তাকে বুঝিয়ে তার লোকজনকে সঠিক পথে নিয়ে আসা যায় কি-না। সে আমাদের সব প্রশ্নের উত্তরে শুধু একটা কথাই বারবার বলছিল– 'I know my fate is decided' (আমি জানি আমার ভাগ্য নির্ধারিত)। অনেক বোঝানোর পরে শেষপর্যন্ত শর্তাধীনে তিনি কথা বলতে রাজি হলেন। শর্তগুলোর মধ্যে প্রধান ছিল– ১. সিরাজ সিকদার ও পার্টির লোকজনের সঙ্গে জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী আচরণ করতে হবে। ২. তাকে রাজনৈতিক বন্দী হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। শর্তাধীন কথা বলতে রাজি হওয়ার বিষয়টি উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের

মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে জানানো হলো। বঙ্গবন্ধুকে বোঝানোর চেষ্টা করা হলো, এই অবস্থায় স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান আসা খুবই দরকার। কারণ সর্বহারাদের অত্যাচারে মানুষ অতিষ্ঠ। এদের যদি নিয়ন্ত্রণে আনা যায়, তাহলে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড অনেকাংশে কমে যাবে। শান্তির পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হবে।

অনেক চিন্তা-ভাবনার পরে বঙ্গবন্ধু আলোচনা করতে রাজি হলেন। তিনি বললেন, 'দেশের আইন মেনে চলতে হবে।' উপস্থিত সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। সব কিছু ঠিকঠাক। এখন কোথায় কিভাবে এই আলোচনা হতে পারে সেই ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা চলছিল।

এরই মধ্যে হঠাৎ করে জানতে পারলাম বঙ্গবন্ধু সিরাজ শিকদারের সঙ্গে কথা বলবেন না। পরে জানতে পারলাম, কোনো এক সিনিয়র কর্মকর্তা তাকে বুঝিয়েছেন, এই লোককে যে জেলে রাখবেন যদি ইন্ডিয়ার হাইকমিশনার কিংবা রাশিয়ার অ্যাম্বাসেডরকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যায় এবং তাদের দাবি যদি হয় সিরাজ শিকদারকে ছাড়, তখন দেশ একটি মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যাবে। এ কারণে বঙ্গবন্ধু তার সঙ্গে কোনো রকম আলোচনায় যেতে রাজি হননি। আমাদের জানানো হলো তাকে সেন্ট্রাল জেলে প্রেরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পরদিন খবরের কাগজ মারফত জানতে পারলাম আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছ থেকে পালানোর সময় গুলিতে সিরাজ শিকদারের মৃত্যু ঘটেছে। ঘটনাটি সাভারের রক্ষীবাহিনীর কাছে ঘটায় অনেকেরই ধারণা রক্ষীবাহিনী জড়িত ছিল। আসলে এই ধারণাটি সম্পূর্ণভাবে ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন।

রক্ষীবাহিনীর অজানা অধ্যায়- ৮

১৫ আগস্ট ভোর আনুমানিক ৫টা সাড়ে ৫টার দিকে বন্ধু আনোয়ারুল আলম (শহীদ) টেলিফোন করল। বলল, তোফায়েল আহমেদ তাকে টেলিফোন করেছিলেন। রক্ষীবাহিনীর কিছু লোক নাকি মণি ভাইয়ের বাসায় আক্রমণ করেছে। আমি বিষয়টি শুনে হতবাক হই এবং বলি, সেটা কীভাবে সম্ভব? তারপর মনে পড়ে, বঙ্গবন্ধুর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া উপলক্ষে সাভার থেকে রিক্রুট ব্যাটালিয়নের কিছু সদস্যের বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় টহল ডিউটির কথা ছিল। উল্লেখ্য, রিক্রুট ব্যাটালিয়নের সদস্যদের সাধারণত এ ধরনের ডিউটি করার কথা নয়। যেহেতু ওই সময় ঢাকায় রক্ষীবাহিনীর কোনো নিয়মিত ব্যাটালিয়ন ছিল না, তাই রিক্রুট ব্যাটালিয়নের সদস্যদের আনা হয়েছিল। এর কিছুক্ষণ পরেই বিষয়টি আস্তে আস্তে পরিষ্কার হয়ে যায়। আমরা বুঝতে পারি এটা রক্ষীবাহিনী নয়। ওরা Armoured corps-এর সদস্য হবে। কারণ তারা কালো ইউনিফর্ম পরিধান করত। আমি শহীদকে বললাম, তুমি অফিসে আস, আমিও অফিসে যাচ্ছি। তখন ভোর আনুমানিক ৬টা। গাড়ি আসতে দেরি হচ্ছে দেখে আমি হেঁটে রওনা দিলাম। গণভবনের কাছাকাছি এসে দেখলাম আমার গাড়িটা আসছে। আমি গাড়িতে উঠে অফিসে গেলাম। ইতোমধ্যে শহীদও অফিসে এসে পৌঁছেছে। তখন আমাদের অফিসের চারপাশে ধীরে ধীরে ট্যাঙ্ক জড়ো হতে থাকে। রেডিওতে মেজর ডালিমের ঘোষণা আসছে। বলা হচ্ছে, বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে। এর কিছুক্ষণ পরে রক্ষীবাহিনীর একটি টহল ট্রাক সদর দফতরে এসে জানাল, বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে। রক্ষীবাহিনীর সদস্যরা এটা নিশ্চিত করার পর এ ব্যাপারে আর কোনো সন্দেহ রইল না। আমি আনোয়ারুল আলম শহীদকে নিয়ে ব্রিগেডিয়ার নূরুজ্জামানের রুমে বসি। ব্রিগেডিয়ার নূরুজ্জামান তখন দেশে ছিলেন না।

তিনি চিকিৎসার জন্য লন্ডনে গিয়েছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে মেজর (অব.) আবুল হাসান খানও (হাসান ভাই, তখন অ্যাক্টিং ডাইরেক্টর ছিলেন) অফিসে এসে উপস্থিত হলেন। আমরা বিষয়টি নিয়ে ভাবতে শুরু করলাম, এখন আমাদের কী করণীয়। এ অবস্থায় আমরা প্রথম টেলিফোন করি রংপুরের ব্রিগেড কমান্ডার কর্নেল কে এন হুদার কাছে। কারণ তিনি ব্রিগেডিয়ার নূরুজ্জামানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার একজন আসামি ছিলেন। ব্রিগেডিয়ার নূরুজ্জামান যখন লন্ডন যান তখন এমনিতেই কথা প্রসঙ্গে বলছিলেন, যদি কোনো প্রয়োজন হয় তাহলে কর্নেল হুদার সঙ্গে যোগাযোগ কর। টেলিফোনে আমরা বিষয়টি কর্নেল হুদাকে জানাই এবং তাকে জিজ্ঞেস করি, তিনি এ ব্যাপারে কী করতে পারবেন? আমাদের লোকজন যারা আছে তাদের বলতে পারি রাজশাহীর দিকে যাওয়ার জন্য যদি তার ব্রিগেড আমাদের সঙ্গে থাকে। তার কথাবার্তায় মনে হলো সেই ধরনের অবস্থান তার নেই। বরং উনি আমাদের বললেন, সেনাপ্রধান জেনারেল শফিউল্লাহর সঙ্গে কথা বলো। সেই অনুযায়ী আমরা সেনাপ্রধানের সঙ্গে কথা বললাম। এই কথোপকথন আমরা লাল টেলিফোনে করছিলাম। জেনারেল শফিউল্লাহর কাছে আমরা অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলাম। সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে উনি কী পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছেন এবং আমাদের কী করা উচিত সে ব্যাপারে কোনো নির্দেশনা দিতে পারেন কিনা। উত্তরে শফিউল্লাহ বললেন, 'আমি কর্নেল শাফায়েত জামিলকে পাচ্ছি না।' শাফায়েত জামিল তখন ৪৬-এর ব্রিগেড কমান্ডার। আমরা বললাম, তাহলে আমাদের কী করণীয়? জেনারেল শফিউল্লাহ বললেন, 'আমি একটু পরে তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করব।' পরে আর কোনো যোগাযোগ হয়নি। তবে জেনারেল শফিউল্লাহর কথাবার্তায় মনে হলো কোনো সিদ্ধান্ত দেওয়ার অবস্থা বা ক্ষমতা তার হাতে নেই। তা না হলে দেশের এই ক্রান্তিলগ্নে সেনাপ্রধান তার ব্রিগেড কমান্ডারকে পাবেন না কেন?

যা হোক, এরপর আমরা টেলিফোন করলাম সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেবকে। আমি তার সঙ্গে প্রথমে কথা বলি। আমরা পরিচয় দিয়ে বললাম, স্যার, বঙ্গবন্ধু আর নেই। এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত হয়েছি। আপনি এখন রাষ্ট্রের অস্থায়ী প্রধান। এই অবস্থায় আমাদের জন্য আপনার কী নির্দেশ? ঢাকায় আমাদের পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়। কারণ এখানে আমাদের enough troops নেই। আমাদের সবগুলো রেগুলার ব্যাটালিয়ন দেশের বিভিন্ন জেলায় দায়িত্বে নিয়োজিত। সাভারে আমাদের তিনটি রিক্রুট

ব্যাটালিয়ন আছে। সাভার রেডিও এখনো সেনাবাহিনী দখল করেনি। আপনি চাইলে আমরা আপনাকে নিয়ে সাভারে যেতে পারি। ওখান থেকে একটা ঘোষণা দিয়ে পদ্মা অতিক্রম করে আমরা ওপাড়ে যাব। আপাতত কুষ্টিয়া বা চুয়াডাঙ্গায় কোথাও অবস্থান নেব। পরবর্তীতে আমাদের যেসব ফোর্সেস চারদিকে ছড়িয়ে আছে তাদের এক জায়গায় আনার চেষ্টা করব। তিনি বললেন, আমি একটু জেনারেল শফিউল্লাহর সঙ্গে কথা বলে আপনাদের জানাব। আমি বললাম, স্যার আমরা তার সঙ্গে কথা বলেছি। জেনারেল শফিউল্লাহ কোনো কিছু করবেন কিংবা করতে পারবেন বলে আমাদের মনে হয় না। ঠিক আছে, আমরা আপনার নির্দেশের অপেক্ষায় রইলাম। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর তার কাছ থেকে কোনো উত্তর না আসায় বন্ধু আনোয়ারুল আলম 'শহীদ' তাকে পুনরায় টেলিফোন করে তার সিদ্ধান্ত জানতে চায় এবং এও বলে, সময় অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বয়ে যাচ্ছে। তিনি বললেন, আমি একটু মনসুর আলী সাহেবের সঙ্গে কথা বলে নিই। ইত্যাবসরে আমরাও ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সাহেবের কাছে টেলিফোন করলাম। সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেবকে যে কথা বলেছিলাম, ওনাকেও একই কথা বললাম এবং আমাদের প্রতি কী নির্দেশনা আছে জানতে চাইলাম। উনি বললেন, আমি সৈয়দ সাহেবের সঙ্গে আলাপ করে আপনাদের জানাচ্ছি। এর পরে আবার সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেবকে টেলিফোন করা হলো। এবারও টেলিফোন করল বন্ধুবর আনোয়ারুল আলম 'শহীদ' এবং বলল, স্যার, সময় অতি দ্রুত চলে যাচ্ছে। এদিকে আমরাও আটকা পড়ে যাচ্ছি। কারণ ট্যাঙ্ক আমাদের চারদিক থেকে ঘেরাও করে ফেলছে। স্যার, আমাদের এখানে অর্থাৎ হেড কোয়ার্টারে গার্ড ছাড়া আর কোনো ট্রুপস নেই। আমাদের ঢাকা ত্যাগ করে সাভারে যেতে হবে। সাভার থেকে ঘোষণা দিয়ে আমাদের পদ্মা অতিক্রম করতে হবে। তিনি শহীদকেও একই কথা বললেন, আমি তো শফিউল্লাহকে পাচ্ছি না। কী করব বুঝে উঠতে পারছি না। কিছুক্ষণ পরে আমরা আবার ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সাহেবের কাছে টেলিফোন করলাম। তখন তিনি আর টেলিফোন ধরলেন না। অন্য একজন টেলিফোন ধরে বললেন, তিনি বাসায় নেই। টেলিফোন রেখে দিলাম। এ অবস্থায় আমাদের বুঝতে কষ্ট হলো না যে, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে হয়তো কোনো সিদ্ধান্ত আসবে না।

সাত-পাঁচ না ভেবেই আমি এবং শহীদ হঠাৎ করে সাভার রওনা করলাম। শহীদ গাড়ি চালাচ্ছিল। আমি তার পাশে বসা। আমিনবাজার

ব্রিজের কাছে আসার পর আমি শহীদকে বললাম, দোস্ত, গাড়িটা থামাও। শহীদ গাড়ি থামাল। হেড কোয়ার্টারে কিছু না বলে কোথায় যাচ্ছি আমরা? যারা হেড কোয়ার্টারে আছে তারা কী ভাববে? আমার মনে হয়, এভাবে কাউকে না জানিয়ে সাভারের দিকে যাওয়া আমাদের ঠিক হবে না। চল আবার হেড কোয়ার্টারে ফিরে যাই। ওখানে গিয়ে চিন্তা-ভাবনা করি। যা হওয়ার ওখানেই হবে।

হেড কোয়ার্টারে ফিরে এসে একটার পর একটা অপশন নিয়ে আমরা আলোচনা করি। যেহেতু রক্ষীবাহিনী একটি প্যারা-মিলিটারি ফোর্স, সেহেতু দেশের ভাগ্য সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বা যোগ্যতা কোনোটাই আমাদের ছিল না। রাজনৈতিক সরকারের পক্ষ থেকেও কোনো দিকনির্দেশনা পেলাম না। প্যারা-মিলিটারি ফোর্স হিসেবে আমরা সরকারের সমর্থনে কাজ করতে পারি। তাই রাজনৈতিক কোনো সিদ্ধান্ত কিংবা দিকনির্দেশনা না পাওয়ায় আমরা অনেকটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ি। রক্ষীবাহিনী সম্পর্কে সেনাবাহিনীর মনোভাব ছিল অনেকাংশে নেতিবাচক। সে ব্যাপারে সন্দেহের কোনো অবকাশ ছিল না। সেনাবাহিনীর ক্ষুদ্র একটি অংশ ক্যু-এর সঙ্গে জড়িত ছিল। তবে সেনাবাহিনীর বাকি অংশও রক্ষীবাহিনীর যে কোনো উদ্যোগের বিরোধিতা করবে বলে মনে হয়েছিল। সেনাপ্রধান জেনারেল শফিউল্লাহর অসহায়ত্ব দেখে সেই ধারণাই আমাদের হয়েছিল। এক সময় ভেবেছিলাম যেহেতু কোনো সরাসরি প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে না, তাই ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে দেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটা গণপ্রতিরোধ গড়ে তোলা যায় কিনা। কিন্তু সেখানেও আমরা চিন্তা করলাম একটা সশস্ত্র বাহিনীর লোক অস্ত্রশস্ত্রসহ সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে গণপ্রতিরোধ গড়ে তুলতে গেলে গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়ার ভয় থেকেই যায়। কারণ এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ এবং নির্দেশ রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। দেশের বিভিন্ন এলাকায় Independent war lords সৃষ্টি হবে। সেই গৃহযুদ্ধের পরিণতি হিসেবে হয়তো হাজার হাজার লোক মারা যেতে পারে। মুক্তিযুদ্ধের সময় বিভিন্ন স্থানে যে Independent war lords সৃষ্টি হয়েছিল এবং তাদের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারটিও আমাদের ভাবিত করে।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালের স্বাধীনতাযুদ্ধে লাখ লাখ শহীদের আত্মত্যাগ দেশের মানুষ কৃতজ্ঞ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। কারণ ওটা ছিল বাঙালি জাতির মুক্তির সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম। যদিও হাজার

হাজার মুক্তিযোদ্ধা কিংবা তাদের সন্তানেরা আজও দুঃখ-কষ্টের মধ্যে অতি মানবেতর জীবনযাপন করছে। তবুও স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ততা একটি বিরল গৌরবের বিষয়। এ সত্যটি চিরকাল অনন্য মহিমায় ভাস্বর হয়ে থাকবে। কিন্তু বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গণপ্রতিরোধ গড়ে তুলতে গিয়ে গৃহযুদ্ধের সৃষ্টি হলে যে হাজার হাজার মানুষ মারা যাবে, এর কোনো যুক্তিসঙ্গত উত্তর থাকবে না। যে কোনো কাজ করার আগে একটা উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এগুতে হয়। কিন্তু তখনকার পরিস্থিতিতে হাজার হাজার নিরীহ মানুষের জীবনের ঝুঁকি নেওয়ার পেছনে কোনো মহৎ উদ্দেশ্য আমাদের বিবেচনায় খুঁজে পাইনি। পরবর্তী অপশন হিসেবে আমাদের কাছে ছিল ঢাকা ছেড়ে কোনো সীমান্তবর্তী এলাকায় গিয়ে আবার পুনর্গঠিত হয়ে একটা প্রতিরোধ তৈরির চেষ্টা করা। কিন্তু রক্ষীবাহিনী এই ধরনের প্রতিরোধ সৃষ্টির চেষ্টা করলে সেনাবাহিনী একযোগে যে আমাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশনে যাবে, এ ব্যাপারে আমাদের মনে কোনো প্রকার সন্দেহ ছিল না। তখন সেনাবাহিনীর সংঘবদ্ধ আক্রমণ প্রতিরোধ করার মতো কোনো শক্তি আমাদের থাকবে না। আর সেই অবস্থায় আমাদের অপশন হিসেবে আসবে– ১. হয় আমাদের আবার সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে গণপ্রতিরোধ (Civil resistance) সৃষ্টি করা অথবা ২. সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে চলে যাওয়া।

সীমান্ত অতিক্রম করার ব্যাপারে আমাদের মনে হলো, ১৯৭১ সালে ভারতে গিয়েছিলাম স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য। সে কারণে তারা আমাদের সাহায্য-সহযোগিতা করেছে। কিন্তু এখন আমরা ভারতে গিয়ে কী করব। শুধু নিজেদের প্রাণ বাঁচানোর জন্য ভারতে যাওয়া আর '৭১ সালে ভারত যাওয়া এক কথা নয়। ১৯৭১ সালে আমরা যে সাহায্য পেয়েছিলাম এবারও তা অব্যাহত থাকবে, এমনটা আশা করার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। এখানে আরও একটি বিষয় আমাদের বড় শঙ্কার কারণ ছিল। তা হলো, রক্ষীবাহিনীকে সাহায্য করার নামে আমাদের বাহিনীর সদস্যদের ছদ্মাবরণে যদি ভারতীয় সেনাবাহিনী পুনরায় বাংলাদেশে প্রবেশ করে, তবে এ দেশের মানুষ বংশপরম্পরায় রক্ষীবাহিনীর সদস্যদের মীর জাফর হিসেবে গালাগাল করবে। আর রক্ষীবাহিনীর গায়ে কলঙ্কের কোনো প্রলেপ পড়ুক তা আমরা কখনোই চাইনি।

এর পর আমরা ভাবলাম শুধু ঢাকাতে সেনাবাহিনী আছে। অন্যান্য জেলায় তো সেনাবাহিনী নেই। ওখানকার মানুষ এ বিষয়টিকে কীভাবে নেয়, তাদের প্রতিবাদ কতটা স্বতঃস্ফূর্ত হয়, সেটা দেখারও একটা বিষয়

ছিল। সবদিক ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত হলো– আমরা কিছুটা সময় নিই। দেখি ঢাকার বাইরে সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া কী হয়। যদিও আমরা খুব আশাবাদী ছিলাম না। কারণ হলো '৭১ সালে আমরা যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছি, আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতাদের জীবন ব্যতীত অন্য কিছু হারানোর ভয় ছিল না। তখন সবাই দেশমাতৃকাকে শত্রুমুক্ত করার জন্য বদ্ধপরিকর ছিলাম। কিন্তু '৭৫ সালের অবস্থা সে রকম ছিল না। তখন অনেকেরই অনেক কিছু হারানোর ভয় ছিল। বিশেষ করে বড় বড় নেতা এবং তাদের স্বজনরা অনেকেই কোটিপতি হয়েছেন, বাড়ি-গাড়ির মালিক বনে গেছেন। তখন তাদের মন-মানসিকতারও পরিবর্তন ঘটেছে। নেতারা সংঘবদ্ধভাবে একটা কঠোর আন্দোলন সৃষ্টি করতে পারবেন, এমন ধারণাও বাস্তব মনে হচ্ছিল না। সবদিকে বিচার-বিশ্লেষণ করার পর আপাতত বিভিন্ন জেলা-মহকুমায় অবস্থানরত কোম্পানি ও ব্যাটালিয়নগুলোকে কৌশলগত কয়েকটি জায়গায়– যেমন বরিশাল, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট ও ময়মনসিংহে জড়ো করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। সেভাবে সব ইউনিটকে নির্দেশ দেওয়া হলো। কারণ ফোর্সকে সুসংগঠিত রাখতে না পারলে আমাদের পক্ষে কিছুই করা সম্ভব নয়। ব্যক্তিগতভাবে আমাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে এ শঙ্কা থাকা সত্ত্বেও দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যদি বাহিনীকে সুসংগঠিত রাখতে পারি তাহলে কোনো ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়াটা অতটা সহজ হবে না। অতঃপর সিদ্ধান্ত হলো পরিণাম যাই হোক, আমরা ঢাকায় আমাদের সদর দফতরেই অবস্থান করব।

আনুমানিক বেলা ১০টা কিংবা সাড়ে ১০টার দিকে আমরা রাজ্জাক ভাইয়ের বাসায় টেলিফোন করি। সেখান থেকে জানানো হলো তিনি বাসায় নেই। তারপর তোফায়েল ভাইয়ের বাসায় টেলিফোন করলাম। হঠাৎ দেখি উনি টেলিফোন ধরেছেন। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, আপনি এখনো বাসায় আছেন, কারণটা কি? তিনি বললেন, কী করব বুঝতে পারছি না। তোমরা আমাকে নিয়ে যেতে পার, তোমাদের ওখানে? আমি বললাম, হ্যাঁ, অবশ্যই, আমরা চেষ্টা করতে পারি। যদিও আমাদের অফিসের চারদিকে ট্যাঙ্ক অবস্থান নিয়েছিল। আমরা একজন অফিসারের নেতৃত্বে কয়েকজন রক্ষীসহ একটি ট্রাক তোফায়েল ভাইয়ের বাসায় পাঠিয়ে তাকে সদর দফতরে নিয়ে আসি। ইতোমধ্যে জয়দেবপুর ক্যান্টনমেন্টের লেফটেন্যান্ট কর্নেল আমিন আহমেদ চৌধুরীর নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর একটি গ্রুপ আমাদের সাভার ক্যাম্পে অবস্থান গ্রহণ করে এবং ওখানে যে ভারতীয় ইনস্ট্রাক্টর ছিল তাদের

এক রকম বন্দী করে নিয়ে যায়। পরবর্তীতে ভারতীয় দূতাবাসে তাদের প্রেরণ করে। পরিস্থিতির ক্রমাবনতি হতে থাকে। ঢাকার বাইরে আমাদের যাওয়ার সুযোগও ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসে। রক্ষীবাহিনীর হেড কোয়ার্টারের চারপাশে ট্যাঙ্ক জড়ো কিংবা নজরদারি রাখলেও আমাদের সাভার রওনা হওয়া আবার মাঝপথে ফিরে আসা কিংবা তোফায়েল ভাইকে আমাদের অফিসে আনা অথবা আমাদের চলাফেরায় তেমন কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি।

রক্ষীবাহিনীর অজানা অধ্যায়- ৯

তোফায়েল আহমেদের অবস্থানের ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির অফিস বঙ্গবভন থেকে বারবার তাগিদ আসছিল। সন্ধ্যার দিকে এ ব্যাপারটি নিয়ে আমরা স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডিআইজি ই.এ চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ করি। তাকে জানাই তোফায়েল আহমেদ আমাদের কাছে আছেন। তাকে হস্তান্তরের জন্য বঙ্গভবন থেকে আমাদের ওপর চাপ প্রয়োগ হচ্ছে। ই.এ চৌধুরী সাহেব জানান, কিছুক্ষণ পর তিনি আমাদের টেলিফোন করবেন। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে ই.এ চৌধুরী টেলিফোন করলেন। উনি বললেন, রাত ৮-৯টার দিকে সিটি এসপি সালাম সাহেবকে আপনাদের অফিসে পাঠাচ্ছি।

রাত ১০টা সাড়ে ১০টা নাগাদ এসপি সালাম সাহেব রক্ষীবাহিনীর সদর দফতরে আসেন। তার কাছে লিখিতভাবে তোফায়েল আহমেদকে হস্তান্তর করি। এসপি সালাম সাহেবও তোফায়েল আহমেদকে লিখিতভাবে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে হস্তান্তর করেন এবং টেলিফোনে বিষয়টি আমাদের অবহিত করেন। এও জানান যে, তার নিরাপত্তার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ইতোমধ্যে খন্দকার মোশতাক প্রেসিডেন্ট হয়ে সরকার গঠন করে। তার প্রতি সেনাবাহিনী প্রধান, নৌ-বাহিনী প্রধান, বিমানবাহিনী প্রধান, বিডিআর প্রধান এবং পুলিশ প্রধান সবাই আনুগত্য ঘোষণা করে। তারপর রক্ষীবাহিনীর প্রশ্ন আসে। এহেন পরিস্থিতিতে অন্যান্য বাহিনী যখন আনুগত্য স্বীকার করেছে তখন রক্ষীবাহিনীরও আনুগত্য স্বীকার ছাড়া অন্য কোনো উপায় ছিল না। কেননা সরকারের বিরুদ্ধে গিয়ে আমাদের টিকে থাকা সম্ভব নয়। সরকারের পক্ষ থেকে রক্ষীবাহিনীর আনুগত্য স্বীকারের তাগিদ আসতে থাকে। তখন রক্ষীবাহিনীর ভারপ্রাপ্ত পরিচালক ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত মেজর আবুল হাসান খান, উনি আমাদের উপ-পরিচালক প্রশাসনের দায়িত্ব পালন করতেন। বয়স ও জ্যেষ্ঠতার দিক থেকে তিনি

আমাদের অনেক সিনিয়র ছিলেন। ব্রিগেডিয়ার নুরুজ্জামান সাহেবেরও সিনিয়র। সুতরাং সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, ভারপ্রাপ্ত পরিচালক হিসেবে তিনি রক্ষীবাহিনীর পক্ষ থেকে আনুগত্য স্বীকার করে আসবেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি আনুগত্য স্বীকার করে আসেন। পরবর্তীতে কেউ হয়তো মোশতাক সাহেবকে বুঝিয়েছিলেন হাসান সাহেবের আনুগত্য স্বীকার রক্ষীবাহিনীর সাধারণ সদস্যদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। সুতরাং উপ-পরিচালক সরোয়ার হোসেন মোল্লা ও আনোয়ারুল আলমের আনুগত্য ঘোষণা ও তা প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রথমাবস্থায় আমরা বলতে চেষ্টা করি যে অন্য সব বাহিনীর প্রধানই শুধু আনুগত্য স্বীকার করেছেন এবং আমাদের বাহিনীর প্রধানও আনুগত্য ঘোষণা করেছেন। সুতরাং আলাদাভাবে আমাদের আনুগত্য ঘোষণার প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি না। অতিমাত্রায় পীড়াপীড়ির কারণে এবং যেহেতু সেই মুহূর্তে আমাদের পক্ষে কিছু করাও সম্ভব ছিল না, শেষপর্যন্ত আমরা দুজনেই আনুগত্য ঘোষণা করি।

পরের দিন সকালে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ সাহেব টেলিফোন করেন। বলেন, সকাল ১০টার দিকে ৪৬ ব্রিগেডের হেড কোয়ার্টারে একটা মিটিং ডাকা হয়েছে। আমাকে এবং শহীদকে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করেন। আমরা তাকে জানাই, আমাদের মধ্যে যে কোনো একজন আসতে পারব। হয় আমি অথবা শহীদ আসবে। আমরা দুজন একসঙ্গে আসতে পারব না। তিনি বললেন, তোমরা আমার ওপর আস্থা রাখতে পার। আমি অনুরোধ করছি, তোমরা দুজনেই আস। আমি তোমাদের জন্য অফিস থেকে গাড়ি এবং একজন অফিসার পাঠাব। সে তোমাদের নিয়ে আসবে এবং মিটিং শেষে পৌঁছে দেবে।

বিষয়টি নিয়ে আমরা অনেক চিন্তা-ভাবনা করলাম। তারপর ভাবলাম উনি এত করে বলছেন, ঠিক আছে আমরা যাই। হাসান ভাই তখন হেড কোয়ার্টারের দায়িত্বে। তাকে বললাম, হাসান ভাই আমরা যাচ্ছি। যদি আমাদের কোনো খবর না পান তাহলে আপনার যে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত সেটাই নেবেন। খালেদ মোশাররফ সাহেব একজন অফিসার পাঠালেন। আমরা তার সঙ্গে ৪৬ ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারে উপস্থিত হলাম। সেখানে খালেদ মোশাররফ ব্রিগেড কমান্ডারের চেয়ারে বসেছিলেন। তার পেছনে রশীদ ও ফারুক দুজনই দাঁড়ানো ছিল। তিনি আমাদের বিষয়টি ব্যাখ্যা করছিলেন, কোন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ ১৫ আগস্টের ঘটনাবলি

ঘটেছে। একপর্যায়ে উনি বললেন, 'শহীদ এবং সরোয়ার Both of you are freedom fighters. I know both of you are patriots, we had to do this to save this country from becoming a Kingdom'. এই কথায় আমরা অনেকটা হতবাক হয়েছিলাম। তার বক্তব্যের সারমর্ম পরবর্তীতে আমরা যেটুকু বুঝতে পেরেছিলাম তা হলো, তিনি উপরের মন্তব্যটি আক্ষরিক অর্থে করেননি। আসলে উনি চাচ্ছিলেন পুরো বিষয়টিকে তার কর্তৃত্বের মধ্যে এনে অবস্থাকে সামাল দিতে। পুরো মিটিংয়ে আমাদের কোনো বক্তব্য ছিল না। আমরা শুধু শুনছিলাম। মিটিং শেষে রক্ষীবাহিনীর হেড কোয়ার্টারে ফিরে এলাম। এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন। রক্ষীবাহিনীতে প্রথমে আমরা দুজন ডেপুটি ডাইরেক্টর হিসেবে যোগদান করলেও পরবর্তীতে মোট ৫ জন ডেপুটি ডাইরেক্টর ছিলাম। মেজর (অব.) আবুল হাসান খান (ডেপুটি ডাইরেক্টর, প্রশাসন), লেফটেন্যান্ট কর্নেল সাবিহউদ্দিন আহমেদ (ডেপুটি ডাইরেক্টর, সিগন্যালস), লেফটেন্যান্ট কর্নেল আজিজুল ইসলাম (ডেপুটি ডাইরেক্টর, জোনাল হেড কোয়ার্টার, চট্টগ্রাম), আনোয়ারুল আলম (ডেপুটি ডাইরেক্টর, ট্রেনিং) এবং আমি (ডেপুটি ডাইরেক্টর, অপারেশন)। ১৫ আগস্ট ঘটনার দিন সাবিহউদ্দিন আহমেদ তার দেশের বাড়ি রংপুরে ছিলেন। ব্রিগেডিয়ার আজিজ সাহেব জোনাল হেড কোয়ার্টার, চট্টগ্রামে ছিলেন। পরবর্তীতে দুজনই ঢাকায় হেড কোয়ার্টারে ফিরে আসেন। অফিসার্স মেসে রাতে আমরা ৫ জন একসঙ্গেই থাকতাম। আমাদের করণীয় বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতাম। একপর্যায়ে সিদ্ধান্ত হলো ব্যাটালিয়নগুলোকে সুসংগঠিত এবং সুসজ্জিত করার। সেই উদ্দেশ্যে আমাদের হেড কোয়ার্টারে রক্ষিত ভারী অস্ত্রশস্ত্র যেমন মেশিনগান, মর্টার প্রভৃতি রেশন পাঠানোর নামে বিভিন্ন ব্যাটালিয়নে ডিস্ট্রিবিউশনের ব্যবস্থা করলাম। এ ব্যাপারে সেনাবাহিনীর তরফ থেকে কিছু আপত্তি এলো। আমরা তখন সিজিএস ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ সাহেবকে জানালাম, আমাদের Troops-কে রেশন পাঠাতে হবে। রেশন না পাঠালে তারা খেতে পারবে না। তাই রেশন পাঠানোর সুযোগ দিতেই হবে। ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ সব শুনে বললেন, ঠিক আছে রেশন পাঠানোর অনুমতি দেওয়া গেল। তোমরা এগুলো সাবধানে পাঠিও। এভাবে রেশনের পাশাপাশি হেড কোয়ার্টারে রক্ষিত ভারী অস্ত্রশস্ত্র বিভিন্ন ব্যাটালিয়নে পাঠানো হলো।

রক্ষীবাহিনীর অজানা অধ্যায়- ১০

ওসমানী সাহেব তার স্বভাবসুলভ ইংরেজি ভাষায় রক্ষীবাহিনীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটি একতরফা সিদ্ধান্ত দিয়ে দিলেন। যার মর্মার্থ হলো- রক্ষীবাহিনীকে ভেঙে দেওয়া হবে। নতুনভাবে একটি বাছাই কমিটি গঠন করা হবে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী যাদের ফিট পাওয়া যাবে তাদের পুলিশ, বিডিআর ও আনসারে নিয়োগ দেওয়া হবে। যাদের ফিট মনে করা হবে না, তাদের অব্যাহতি দেওয়া হবে। এভাবে বাহিনীর ভাগ-বাটোয়ারার সিদ্ধান্ত জানানো শেষে উপস্থিত সবার উদ্দেশে বললেন, 'Gentelmen, what is your opinion about this? এ সময় ব্রিগেডিয়ার এমএ মঞ্জুর বললেন, স্যার রক্ষীবাহিনীর ডেপুটি ডাইরেক্টর সরোয়ার হোসেন মোল্লা এখানে উপস্থিত আছেন। আমার মনে হয়, এ ব্যাপারে তার মতামত নেওয়া উচিত। জেনারেল ওসমানী সাহেব আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'Yes gentelman, what have you got to say about this matter?' আমি অত্যন্ত শান্ত কণ্ঠে বললাম, স্যার, বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তার দায়িত্ব আমাদের ছিল না। তবুও এ কথা অনস্বীকার্য যে বঙ্গবন্ধুর জীবন রক্ষার জন্য আমরা কিছুই করতে পারিনি। আর সুযোগও ছিল না। তবুও ব্যর্থতার এই গ্লানি আমাদের সারাজীবন বইতে হবে। কিন্তু এই বাহিনীকে রক্ষা করতে আমাদের যা কিছু দরকার হবে আমরা তাই করব। আমি আরও বললাম, স্যার আমাদের সব ব্যাটালিয়ন কমান্ডার স্ব-স্ব ব্যাটালিয়ন হেড কোয়ার্টারে ওয়্যারলেস সেটের সামনে বসে আছে তাদের সম্পর্কে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে তা জানার জন্য। সুতরাং তাদের ব্যাপারে কোনো হঠকারী সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে তা তারা মেনে নেবে না। এর ফলে দেশে যদি কোনো বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তার জন্য রক্ষীবাহিনী দায়ী থাকবে না।

আমার কথা শুনে জেনারেল ওসমানী সাহেব অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন In that case let me go and talk to the president. এ কথা বলে উনি কক্ষ ছেড়ে চলে গেলেন। আমরা ওখানে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেছিলাম। উনি আর ফিরে আসেননি।

যা হোক, আমরা বঙ্গভবন ত্যাগ করার জন্য গেটের সামনে গাড়িতে উঠতে যাব এমন সময় ব্রিগেডিয়ার মঞ্জুর বললেন, সরোয়ার তুমি আমার গাড়িতে এসো। আমি প্রথমে অসম্মতি জানালাম। উনি বললেন, তোমার সঙ্গে জরুরি কথা আছে। চলো আমি তোমাদের হেড কোয়ার্টারে যাব। তারপর আমরা একই গাড়িতে রক্ষীবাহিনীর সদর দফতরে আসি। আমি আনোয়ারুল আলম (শহীদ), ব্রিগেডিয়ার সাবিহউদ্দিন এবং হাসান ভাই একসঙ্গে বসে মঞ্জুর সাহেবের সঙ্গে রক্ষীবাহিনীর ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা হলো। ব্রিগেডিয়ার মঞ্জুর নিজেই আলোচনার সূত্রপাত করেন। তিনি বলেন, দেখ বর্তমান অবস্থায় এই ফোর্সকে এভাবে রাখা সম্ভব হবে না। কারণ সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তোমরা কতক্ষণ লড়বে। কাজেই আমার একটা প্রস্তাব আছে, যদি তোমরা রাজি থাক।

জিজ্ঞেস করলাম, প্রস্তাবটা কী? তিনি বললেন, রক্ষীবাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে সেনাবাহিনীতে একীভূত করার ব্যাপারে তোমাদের কী মতামত? তোমরা ঠাণ্ডা মাথায় বিষয়টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা কর। আমি ক্যান্টনমেন্টে যাচ্ছি। I will discuss it with Army chief General Ziaur Rahman. এ বিষয়ে পরে তোমাদের জানানো হবে। ব্রিগেডিয়ার মঞ্জুর পরের দিন আমাকে, শহীদকে এবং ব্রিগেডিয়ার সাবিহউদ্দিন সাহেবকে জেনারেল জিয়াউর রহমান সাহেবের বাসায় যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। যাওয়ার আগে আমরা বিষয়টি নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করলাম। আমরা ভাবলাম, এই ফোর্সকে এখন এভাবে রেখে কী লাভ হবে? মোশতাক সরকারের দায়িত্ব পালনের জন্য এ ফোর্সকে রাখার কোনো অর্থ আছে বলে মনে হয় না। সুতরাং আমরা এই বৈরী পরিস্থিতির মধ্যে পুরো বাহিনীকেই যদি সেনাবাহিনীতে আত্তীকরণ করাতে পারি, তাহলে আমাদের অফিসার এবং সদস্যদের আত্মসম্মান রক্ষা সম্ভব হবে। আধা-সামরিক বাহিনী থেকে পূর্ণ সামরিক বাহিনীর মর্যাদা লাভ করবে। নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কয়েকটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম। সিদ্ধান্তগুলো হলো– ১. ব্রিগেডিয়ার নূরুজ্জামানের হাতেই যেহেতু এই ফোর্স গড়ে উঠেছে, সুতরাং সেনাবাহিনীতে আত্তীকরণ হওয়ার আগে তাকে দেশে

ফিরিয়ে আনতে হবে। ২. আমাদের বাহিনীর অফিসার জেসিও এবং এনসিও বর্তমানে যে যেই র‍্যাঙ্কে আছে, তাদের সেনাবাহিনীতে ঠিক একই র‍্যাঙ্কে নিতে হবে। সেই অনুযায়ী আমরা জেনারেল জিয়াউর রহমানের বাসায় যাই এবং আমাদের বক্তব্য আমরা পরিষ্কারভাবে তুলে ধরি। জেনারেল জিয়াউর রহমান আমাদের প্রস্তাবগুলো গ্রহণ করেন। আমরা জানতে চাইলাম, রক্ষীবাহিনীকে সেনাবাহিনীতে আত্তীকরণের ব্যাপারে তিনি ওসমানী এবং প্রেসিডেন্ট মোশতাক সাহেবকে রাজি করাতে পারবেন কিনা। তিনি উত্তরে বললেন, 'Leave that to me.' জেনারেল জিয়াউর রহমান এবং ব্রিগেডিয়ার মঞ্জুরের এই উদ্যোগ গ্রহণের পেছনে যে দুটি মূল কারণ ছিল তা হলো মিরপুর, সাভার, চিটাগাং, সিলেট, রাজশাহী, ময়মনসিংহ এবং খুলনাসহ বিভিন্ন জায়গায় রক্ষীবাহিনীর জন্য নির্মিত অফিস, ব্যারাক এবং একসঙ্গে ১৫টি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যাটালিয়ন সব কিছু যদি আর্মির অধীনে আসে, তাহলে আর্মির প্রসারণের কাজটি অতি সহজে করা সম্ভব হবে। সেনাবাহিনীর যে ব্রিগেড কনসেপ্ট আছে তা থেকে ডিভিশন কনসেপ্টে চলে যাওয়াও হবে অতি সহজ। দ্বিতীয় বিবেচনার বিষয় ছিল, ওই সময় আর্মিতে মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম ছিল। রক্ষীবাহিনীর সদস্যদের প্রায় একশভাগই ছিল মুক্তিযোদ্ধা। সুতরাং আত্তীকরণের ফলে সেনাবাহিনীতে মুক্তিযোদ্ধারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে।

এর পরদিন আমরা ব্রিগেডিয়ার নুরুজ্জামানের সঙ্গে লন্ডনে কথা বলে সেনাবাহিনীতে আত্তীকরণের বিষয়টি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করি। তাকে বলি, রক্ষীবাহিনী আপনি যে রকম রেখে গিয়েছিলেন তার সবকিছুই ঠিকঠাক আছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে এর চেয়ে ভালো কিছু ফোর্সের জন্য করতে পারব বলে মনে হয় না। সুতরাং এ ব্যাপারে আপনার কী মতামত তা জানালে, সেই অনুযায়ী আমরা পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করব। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে বললেন, দেখ তোমরা যা করেছ আমি দেশে থাকলে হয়তো এটা করতে পারতাম না। সুতরাং তোমরা যেটা করেছ ওটাই সঠিক সিদ্ধান্ত। আমি যত তাড়াতাড়ি পারি দেশে ফেরার চেষ্টা করছি।

কয়েক দিন পরই ব্রিগেডিয়ার নুরুজ্জামান সাহেব দেশে ফিরে আসেন। রক্ষীবাহিনীর ব্যাটালিয়নগুলোকে একটির পর একটি সেনাবাহিনীর কাছে হস্তান্তর করা হয়। রক্ষীবাহিনীকে সেনাবাহিনীতে আত্তীকরণের সরকারি সিদ্ধান্ত ঘোষণার কয়েক দিন পরে আমাকে ও শহীদকে সেনাপ্রধান জেনারেল জিয়াউর রহমান তার অফিসে ডেকে পাঠান। জানতে চান

আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী? তিনি আরও বলেন, 'যেখানে রক্ষীবাহিনীর সব জওয়ান, অফিসার সেনাবাহিনীতে আত্তীকৃত হয়েছে; সেখানে তোমরা দুজন যদি বাইরে থাক, সেটা তোমাদের প্রতি অবিচার করা হবে এবং রক্ষীবাহিনীর অন্য সদস্যরা মনে করবে আমরা তোমাদের প্রতি অন্যায় করেছি। সুতরাং তোমরা দুজনই সেনাবাহিনীতে যোগদান কর। রক্ষীবাহিনীতে তোমাদের ডেপুটি ডাইরেক্টরের পদটি লেফটেন্যান্ট কর্নেলের সমমর্যাদার। আমি চাই তোমরা লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদে সেনাবাহিনীতে যোগদান কর।

আমরা তাকে জানালাম, স্যার আমরা সেই স্বাধীনতা যুদ্ধ থেকে শুরু করে রক্ষীবাহিনীকে সংগঠিত করা পর্যন্ত এত ব্যস্ততার মধ্যে ছিলাম যে, আমাদের এখন বিশ্রাম প্রয়োজন। সে জন্য সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। আমরা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে ফিরে যেতে চাই। তাছাড়াও এ বিষয়টিকে সেনাবাহিনীর অফিসাররাও খুব ভালো চোখে দেখবে বলে মনে হয় না। সুতরাং আমরা অযথাই তাদের অন্তর্জ্বালার কারণ হতে চাই না।

জেনারেল জিয়াউর রহমান বললেন, সেটা তোমাদের বিবেচনার বিষয় নয়। সব কিছু আমার ওপর ছেড়ে দাও। I will do what is good for you. আরও বললেন, তোমরা মোশতাক সাহেবদের চেন না। এরা তোমাদের ভালোভাবে থাকতে দেবে না। নানাভাবে উৎপীড়ন করবে। বেকায়দায় ফেলবে। তোমাদের নিরাপত্তার স্বার্থে আমি চাই তোমরা সেনাবাহিনীতে যোগদান কর। আমরা আবারও জোর দিয়ে বললাম, স্যার সেনাবাহিনীতে আমরা misfit হব। আমরা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে ফিরে যেতে চাই। পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত নেব কোন পেশায় গেলে ভালো হবে। এ কথা বলে আমরা তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসি। এর দুই দিন পরই সরকারি গেজেটের মাধ্যমে আমাদের দুজনকে লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। আমরা বিষয়টি নিয়ে আবারও জেনারেল জিয়াউর রহমানের সঙ্গে কথা বলি। উনি আগের কথাই বলেন যে, আমি বিষয়টি ভালোভাবে চিন্তা করেছি। এটাই তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে বলে মনে করছি। আশা করি, তোমরা আমার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। পরবর্তীতে জানতে পেরেছিলাম ব্রিগেডিয়ার নুরুজ্জামানই এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং জেনারেল জিয়াউর রহমানকে দিয়ে তা বাস্তবায়ন করিয়েছিলেন। আমরা সেনাবাহিনীতে যোগ দিলাম।

আমাদের দুজনের জন্য একটি অরিয়েন্টেশন কোর্সের ব্যবস্থা করা হলো। জ্যাগ ব্রাঞ্চে ১৫ দিন, জিএস ব্রাঞ্চে ১৫ দিন, এজিএস ব্রাঞ্চে ১৫ দিন, ৫৫ ব্রিগেডে ১ মাস এবং কুমিল্লা মিলিটারি একাডেমীতে ১ মাস।

৭ নভেম্বরের ঘটনা

সেনাবাহিনীর মাঝে খন্দকার মোশতাক এবং তার সহযোগীদের সম্পর্কে তীব্র অসন্তোষ দানা বাঁধতে থাকে। সব ব্যাপারে খুনিদের বাড়াবাড়ি সেনাবাহিনীর অনেকেই সহ্য করতে পারছিলেন না। সেনাবাহিনীর বেশ কিছু অফিসার এসব খুনির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য জেনারেল জিয়াউর রহমানের ওপর চাপ প্রয়োগ করে আসছিলেন। কিন্তু তিনি কার্যকর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় তাকেই সেনাবাহিনী প্রধানের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার গোপন পরিকল্পনা চলছিল। তার ফলশ্রুতিতে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে ১৯৭৫ সালের ২ নভেম্বরের ক্যু সংঘটিত হয়। তখন আমি ও শহীদ অরিয়েন্টেশন কর্মসূচি মোতাবেক কুমিল্লায় মিলিটারি একাডেমীর অফিসার্স মেসে অবস্থান করছিলাম। পরবর্তীতে ২ নভেম্বর ক্যু'র ব্যর্থতা এবং জাসদ ও গণবাহিনী সমর্থিত ৭ নভেম্বর বিপ্লব সম্পর্কে ব্রিগেডিয়ার সাবিহউদ্দিন এবং সংশ্লিষ্ট অন্য কর্মকর্তাদের বক্তব্যের মর্মার্থ অনেকটা এমন দাঁড়ায় যে, ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ যদি শুধু সেনাপ্রধান হতে চাইতেন, তা তিনি সহজেই হতে পারতেন। কিন্তু তার আসল উদ্দেশ্য ছিল একই সঙ্গে সেনা ও রাষ্ট্রপ্রধানের পদ লাভ করা। সেই লক্ষ্যে ব্যক্তিগত শক্তি সুসংহত করতে এবং একটি সাংবিধানিক পথ উদ্ভাবনের কাজে বেশি সচেষ্ট ছিলেন। এমন চিন্তা করার পেছনে প্রথম কারণ– ৩ নভেম্বর সকালেই ক্যু-এর সপক্ষে কারণগুলো ব্যাখ্যা করে একটি ঘোষণাপত্র লিখে তার হাতে দিয়ে তা বেতারে পাঠ করার জন্য বলা হয়, যাতে করে দেশের মানুষ অন্ধকারের মধ্যে না থেকে প্রকৃত অবস্থাটা জানতে পারে। কিন্তু বার বার অনুরোধের পরও তিনি তা বেতারে ঘোষণা করেননি। শেষের দিকে এক সময় তিনি জানান, ঘোষণার কপিটি খুঁজে পাচ্ছেন না। আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, যুদ্ধের সময় তার অনুগত সেক্টর-২ এর অফিসারদের ঢাকায় একত্রিত করা। অনেক পর্যবেক্ষক এমনও মত পোষণ করেন যে, 'Brig. Khaled Mosharraf was trying to stage a coup wihin a coup'. ২ থেকে ৬ নভেম্বর সারা দেশের মানুষ থাকে অন্ধকারে। ঢাকা শহর পরিণত হয় গুজবের শহরে। চারদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়

খালেদ মোশাররফ ভারতের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা নিয়েছে এবং ভারতের চর হিসেবে কাজ করছে। বিমান ও সেনাবাহিনীর (বিশেষ করে আর্টিলারি, ইঞ্জিনিয়ার্স ও আর্মড কোরের) জাসদ ভাবাপন্ন সদস্যরাই এই গুজব প্রচারে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করে। এখানে আরও একটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার তা হচ্ছে, ৩ নভেম্বর ঢাকায় ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের মায়ের নেতৃত্বে ক্যু'র সমর্থনে আওয়ামী লীগ একটি মিছিল বের করে। এই অপরিণামদর্শী ঘটনাটিও গুজবের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। পরিণামে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের মতো একজন দক্ষ অকুতোভয় সেনানী, সাচ্চা দেশপ্রেমিক বীর মুক্তিযোদ্ধার ভাগ্যে করুণ পরিণতি নেমে আসে। অন্যদিকে সেনাবাহিনীর ক্রান্তিলগ্নে সৃষ্ট শূন্যতা ও আকস্মিকভাবে সৃষ্ট সুযোগের ব্যবহারকল্পে জাসদ এবং গণবাহিনীর নেতৃবৃন্দের তাৎক্ষণিক হঠকারী সিদ্ধান্তের ফলে জন্ম নেওয়া সিপাহি বিপ্লবও একই পরিণতি লাভ করে। মাঝখানে কিছু নিরীহ অফিসার প্রাণ হারান।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চাকরির প্রেক্ষাপট

পরবর্তীতে জেনারেল জিয়াউর রহমান মুক্ত হয়ে বিভিন্ন সেনানিবাসে ঘুরে ঘুরে পুরো পরিস্থিতি তার নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছিলেন। আমি আর আনোয়ারুল আলম (শহীদ) তখন কুমিল্লা সেনানিবাসে অবস্থান করছিলাম। জেনারেল জিয়াউর রহমান কুমিল্লায় গিয়ে আমাদের দেখে বলেন, তোমরা এখানে কি করছ? আমরা বললাম, স্যার আপনিই তো আমাদের BMA-তে পাঠালেন Passing out দেখার জন্য। তখন জিয়াউর রহমানের পিএস ছিল কর্নেল অলি আহমদ। তিনি কর্নেল অলি আহমদকে ডেকে বললেন, 'ঢাকায় গিয়ে আমাকে Remind করিয়ে দেবে যে আমি ওদের দুজনকে এখানে দেখেছি। এর কারণ হলো, ইতোমধ্যে আর্মি ইন্টেলিজেন্স থেকে জেনারেল জিয়াউর রহমানকে জানানো হয়েছিল যে, আমরা দুজন নাকি আগরতলায় চলে গেছি। আমাদের সেখানে দেখাও গেছে। যা হোক এর কিছুদিন পরে আমাদের দুজনকে ঢাকায় সেনা সদর দফতরে বদলি করে আনা হলো। আমরা সেনা সদর দফতরে ১৯৭৬-৭৮ সাল পর্যন্ত ৩ বছর কাজ করি। ১৯৭৮ সালের শেষের দিকে একদিন সেনাপ্রধানের দফতরে আমাদের দুজনকে ডাকা হলো। বিভিন্ন কথাবার্তার এক পর্যায়ে জেনারেল জিয়াউর রহমান বললেন, তোমরা রাজি থাকলে আমি তোমাদের বাংলাদেশের যে কোনো দূতাবাসে ফার্স্ট সেক্রেটারি হিসেবে পোস্টিং দিতে পারি। তোমরা

সেনাবাহিনী থেকে ডেপুটেশনে যাবে। দুই-তিন বছর পরে এসে পুনরায় সেনাবাহিনীতে যোগদান করবে। এতে তোমাদের জ্ঞানের পরিধি বাড়বে এবং বিদেশ সম্পর্কে অনেক কিছু শিখতেও পারবে।

আমাদের মনে হলো যে, এ বিষয়ে তিনি স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। তাই অনেক চিন্তা-ভাবনা করে দেখলাম, সেনাবাহিনীতে আমাদের ভবিষ্যৎ খুব একটা সুখকর হবে না। কারণ রক্ষীবাহিনী থেকে এসে সরাসরি লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদে যোগদানের ব্যাপারটি সেনাবাহিনীর অনেক অফিসারই ভালোভাবে মেনে নিতে পারেননি। এর ফলে সেনাবাহিনীর অনেক সিনিয়র এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অফিসার পদমর্যাদার দিক থেকে আমাদের জুনিয়র হয়ে গেছেন। সবকিছু ভেবেচিন্তে আমরা ফরেন সার্ভিসে যেতে রাজি হলাম। আমাকে ফার্স্ট সেক্রেটারি হিসেবে থাইল্যান্ডে এবং শহীদকেও একই পদে ইন্দোনেশিয়ায় পাঠানোর জন্য ১৯৭৮ সালের নভেম্বরের দিকে অর্ডার ইস্যু করা হয়। ১৯৭৯ সালের ১০ জানুয়ারি আমরা দুজনে নতুন কর্মস্থলের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করি। পরবর্তীকালে আমাদের দুজনকেই লেফটেন্যান্ট কর্নেল থেকে কর্নেল পদমর্যাদায় পদোন্নতি দিয়ে চাকরি স্থায়ীভাবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আত্তীকরণ করা হয়।